দস্যু বনহুর
অজানা দেশে
রোমেনা আফাজ
সেবা
প্রকাশনী

দস্যু বনহুর সিরিজ

অজানা দেশে-৯৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর সামনে তাকাতেই দেখলো বাঘের চামড়া পরা এক তরুণ জংলী তীর-ধনু হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বার ধনুকে তীর সংযোগ করতেই বনহুর ফুল্লরাসহ ক্ষিপ্রগতিতে সরে দাঁড়ালো।

জংলীটির নিক্ষিপ্ত তীর এসে বিদ্ধ হলো একটি গাছের গোড়ায়।

জংলী তরুণটি এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর, ঠিক যেমন করে হিংস্র বাঘ তার শিকারের উপর আক্রমণ চালায়।

বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো তীর-ধনুসহ জংলীর ডান হাতখানা। ভীষণ জোরে চাপ দিতেই জংলী তরুণের হাত থেকে তীর ধনু খসে পড়লো মাটিতে।

জংলী তরুণের দেহেও কম শক্তি ছিলো না তবু সে কাহিল হয়ে পড়লো বনহুরের কাছে।

ফুল্লরার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়লো।

অবাক হয়ে দেখছে সে।

জংলীটির হাত থেকে যখন তীর-ধনু মাটিতে খসে পড়লো তখন সে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়লো, দ্বিতীয় বার বনহুরকে আক্রমণ করার সাহস পেলো না। দৌড়ে পালিয়ে গেলো সে গভীর জঙ্গলের ভিতরে।

বনহুর তাকালো ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরা চোখ দুটো নত করে নিলো, কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তার মন।

বনহুর বললো—চলো ফুল্লরা, এখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না, ওরা হামলা চালাতে পারে।

ফুল্লরা আর বনহুর দ্রুত পা বাড়ালো।

ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল ভেদ করে ওরা দু'জন এগিয়ে যাচ্ছে।

সোজা পথ ধরে এগুলে নানা ধরনের বিপদ আসতে পারে তাই বনহুর আত্মগোপন করে চলাই শ্রেয় মনে করলো।

পথ তো আর কম নয়।

এগুচ্ছো তো এগুচ্ছেই।

হঁঠাৎ এমন সময় ঝোপঝাড় দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে এলো একদল জংলী। সবার হাতেই তীর-ধনু।

বনহুর আড়াল থেকে লক্ষ্য করে চমকে উঠলো, কারণ সংখ্যায় দু' শতের বেশি হবে জংলীরা। বুঝতে পারলো বনহুর, সেই জংলীটি গিয়ে দলবলকে খবর দিয়েছে। অমনি তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসেছে। যদি তারা ওদের সন্ধান পায় তাহলে আর রক্ষা নেই। যেমন করে হোক আড়ালে আত্মগোপন করতে হবে।

বললো বনহুর ফুল্লরার কানের কাছে মুখ নিয়ে—সাবধানে লুকিয়ে পড়ো। যদি ওরা দেখে ফেলে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য।

ফুল্লরার মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ না হয়ে বরং কিছুটা দীপ্ত হলো, চাপাকণ্ঠে বললো—জংলীদের সর্দার আমার চেনা, সে এসে গেছে, কাজেই আর ভয় নেই। কথাটা বলে ফুল্লরা ঝোপটার বাইরে বেরিয়ে এলো।

বনহুরের চোখ হকচকিয়ে গেলো, একি কান্ড করলো ফুল্লরা! জংলীরা ওকে নিশ্চয়ই হত্যা করে বসবে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, ফুল্লরা বাইরে গিয়েই নাচতে শুরু করলো।

জংলীরা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে তার কাছাকাছি।

সবাই প্রায় দৌড়ে আসছে ফুল্লরার দিকে।

সবার আগে বাঘের চামড়া পরা মাথায় নরমুন্ডের মুকুট, গলায় হাড়ের মালা বোধ হয় সর্দার বা দলপতি হবে, এগিয়ে এলো সে ফুল্লরার নিকটে।

জংলীরা ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে তীর-ধনু উঁচু করতেই দলপতি হাত উঁচু করে থামিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে জংলীরা তীর-ধনু নিচু করে নিলো।

বনহুর আড়াল থেকে সব দেখতে লাগলো।

দলপতির ইংগিতে জংলীরা তাদের তীর-ধনু সংযত করে নিতে বাধ্য হলো, নইলে এতক্ষণে ফুল্লরার দেহ ঝাঝরা হয়ে যেতো তীর ফলকের আঘাতে। কিন্তু দলপতি ফুল্লরাকে চিনলো কি করে!তবে কি ফুল্লরার নাচ তাকে মুগ্ধ করেছে? ঠিক তাই হবে। ভালভাবে তাকালো বনহুর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ফুল্লরার দিকে।

জংলী পরিবেষ্টিত ফুল্লরা দক্ষ নর্তকীর মত নেচে চলেছে। ফুল্লরার নাচ দেখে বনহুরের মনে বারবার নূরীর মুখখানা ভেসে উঠছিলো। যেন নূরী নাচ দেখাচ্ছে, দলপতির স্থানে যেন সে নিজে...

ফুল্লরার নাচ দেখে মাথা দোলাচ্ছে দলপতি।

জংলীরা অবাক, যদিও তাদের চোখেমুখে হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। তারা নাচ দেখছে এবং মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে দলপতির দিকে।

দলপতির বিশাল দেহটা আনন্দে দুলে দুলে উঠছে।

ফুল্লরার নাচ শেষ হলো।

দলপতি ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে কিছু বললো।

ফুল্লরা হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালো দলপতির সম্মুখে।

দলপতি নিজ আংগুল থেকে নর কঙ্কালের আংটি খুলে ফুল্লরাকে দিলো।

ফুল্লরা মাথা নত করে অভিবাদন জানালো।

এবার ফুল্লরাকে দলপতি কিছু বললো।

ফুল্লরার মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হলো।

বনহুর ঝোপটার মধ্য হতে লক্ষ্য করছে ভালভাবে। দলপতির কথার একটি শব্দও বনহুর বুঝতে পারলো না। ফুল্লরা ঠিক বুঝতে পারছে সবকিছু, এটা বনহুর অনুধাবন করে নিতে সক্ষম হলো। আরও বুঝতে পারলো দলপতি এখন যা বলছে তা ফুল্লরার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে।

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেলো, সে দেখলো ওরা ফুল্লরাকে নিয়ে চললো সঙ্গে করে।

ফুল্লরা বিনা দ্বিধায় এগিয়ে যাচ্ছে, তবে সবার অলক্ষ্যে সে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো, বনহুর যে ঝোপটার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে সেইদিকে।

ফুল্লরাকে নিয়ে জংলীরা হর্ষধ্বনি করতে করতে চলে গেলো।

এবার বনহুর বেরিয়ে এলো ঝোপটার মধ্য হতে।

এতক্ষণ সে নীরব ছিলো, কারণ ফুল্লরার কোনো বিপদ ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কায় সে জংলীদের কার্যকলাপে কোনো বাধা দেয়নি। এবার সে ঝোঁপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এবং যে পথে ফুল্লরাকে নিয়ে জংলীদল চলে গিয়েছিলো সেইদিকে পা বাড়ালো। একটু এগুতেই দেখলো বনহুর একটি চুড়ি পড়ে আছে নিচে। চুড়িটা বনহুর উঁচু হয়ে তুলে নিলো। চোখের সামনে চুড়িটা ধরেই বুঝতে পারলো সে, এ চুড়িটা ফুল্লরার হাতের ছাড়া আর কারও নয়। ফুল্লরার হাতেই দেখেছিলো বনহুর বেশ কিছু কাঁচের চুড়ি।

চুড়িটা পকেটে রেখে বনহুর পা চালালো।

কিছুটা এগুতেই আবার কুড়িয়ে পেলো আরও একটি কাঁচের চুড়ি। চুড়িগুলো ফুল্লরা তাহলে আপন ইচ্ছায় খুলে ফেলে দিয়ে পথের নির্দেশ জানিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লো, কারণ দীর্ঘ সময় সে অভুক্ত রয়েছে। আশেপাশে কোনো ফলের গাছ না থাকায় আরও কষ্ট হচ্ছে তার। তবু আনন্দ ফুল্লরার সন্ধান সে পেয়েছে। যদিও জংলীদের কবলে এখন রয়েছে সে তবুও কতকটা নিশ্চিন্ত বলা যায়।

জংলীদের সর্দার ফুল্লরার নাচে অভিভূত, মুগ্ধ, কাজেই তাকে উদ্ধার করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। বনহুর এগিয়ে চলে দ্রুত, কারণ জংলীরা ফুল্লরাসহ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

❑

পরপর আরও কয়েকগাছা চুড়ি কুড়িয়ে পেলো বনহুর। এই চুড়িগুলো তাকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে বনহুর হুম্ হুম্ শব্দ, তার সঙ্গে আরও একটা শব্দ তার কানে প্রবেশ করছে। যেন কোনো মাদলের আওয়াজ।

ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে।

সূর্যের আলো নিভে গেছে গভীর জঙ্গলের জমাট অন্ধকারে। যেদিক থেকে হুম্ হুম্ আওয়াজ আর মাদলের শব্দ আসছিলো সেইদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে মশালের আলোতে।

বনহুর খুব জোরে পা চালালো।

কিছুদূর এগুতেই মশালের আলোতে বনহুর নজর পড়লো, জংলী সর্দার বসে আছে একটা উঁচু আসনে। তার পাশে এবং পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত জংলী। প্রতিটি জংলীর হাতে তীরধনু রয়েছে।

বনহুর একটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলো। দলপতির সম্মুখে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে একটা অগ্নিকুন্ড।

দু'জন জংলী অগ্নিকুন্ডে শুকনো কাঠ নিক্ষেপ করছে।

পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন জংলী মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে।

বাজনার তালে তালে হুম্ হুম্ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে জংলীদের মুখ থেকে।

মাঝখানে ফাঁকা কিছুটা জায়গা। ফুল্লরা নেচে চলেছে। আগুনের লালচে আলোতে ফুল্লরাকে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মতই মনে হচ্ছে।

দলপতি এবং তার দলবল ফুল্লরার নাচ দেখছিলো আর হুম্ হুম্ শব্দ করছিলো।

সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

বনহুর অবাক হয়ে যায়।

ফুল্লরা এত সুন্দর নাচতে পারে! সে বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগলো।

দলপতি মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করে উঠছে।

অগ্নিকুন্ডের লেলিহান শিখার লালচে আলোতে দলপতির চোখ জ্বলছে যেন। মাথায় নরমুন্ডের মুকুট, গলায় নরকঙ্কালের মালা, পরনে বাঘের চামড়ার বর্ম।

হিংস্র জানোয়ারে চেয়েও ভয়ংকর মনে হচ্ছে তাকে। বনহুর ভাবছে ফুল্লরার মধ্যে এমন একটা প্রতিভা আছে যে প্রতিভার্ দ্বারা সে হিংস্র জংলীরাজকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে।

ফুল্লরা তখনও নেচে চলেছে।

ঠিক নূরীর মতই নাচতে শিখেছে ফুল্লরা, সে নাচের তুলনা হয় না।

এক সময় নাচ শেষ হলো।

অগ্নিকুন্ডের আলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এলো।

জংলীরা চলে গেলো যে যার গুহা বা আস্তানায়। দলপতি ফুল্লরাকে নিয়ে তার বাসস্থান কাঠের কুটিরে প্রবেশ করলো।

বনহুর আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছে।

জংলী দলপতি ফুল্লরা সহ তার কাঠের কুটিরে প্রবেশ করতেই দু'জন তীর-ধনুধারী জংলী কুটিরের দরজার দু'পাশে দন্ডায়মান হলো।

বনহুরের বুকটা ধক্ করে উঠলো, তাহলে কি জঙলীরাজের কোনো কুৎসিত বাসনা রয়েছে....বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে দ্রুত এসে পড়লো কুটিরটার পেছন দিকে। কুটিরের ভিতর দপদপ্ করে মশাল জ্বলছে।

বনহুরের কানে ভেসে এলো ফুল্লরার মিনতিভরা করুণ কণ্ঠস্বর, জংলী দলপতিকে লক্ষ্য করে জংলীদের ভাষায় সে কিছু বলছে।

কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলো বনহুর, জংলীরাজ ফুল্লরার প্রতি কুৎসিত আচরণ করতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বনহুর কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো কুটিরের ভিতরে। মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখলো ফুল্লরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পিছু হটছে, করুণ তার চেহারা।

জংলীরাজ হিংস্র জানোয়ারে মত এগুচ্ছে ফুল্লরার দিকে।

ছোট্ট কুটির।

কাজেই বেশি দূর তাকে এগুতে হলো না, ধরে ফেললো জংলী রাজ ফুল্লরার কচি-কোমল হাতখানা কঠিন থাবায়।

বনহুর মুহূর্ত দেরি না করে পহারাদার জংলীদের একজনকে ধাকা মেরে ফেলে দিয়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিলো তীর-ধনু। ক্ষিপ্ততার সঙ্গে কাঠের বেড়ার ফাঁকে তীর প্রবেশ করিয়ে জংলীরাজের পিঠ লক্ষ্য করে ছুড়লো।

জংলীরাজ ফুল্লরার দেহটাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে যাচ্ছিলো, এ মুহূর্তে বনহুরের তীর গিয়ে বিদ্ধ হলো জংলীরাজের পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে ফুল্লরাকে মুক্ত করে দিলো। মুখখানা তার বিরাট আকারে হা হয়ে পড়েছে।

এদিকে প্রহরীদ্বয় আক্রমণ করে বসলো বনহুরকে।

বনহুর হস্তস্থিত তীর-ধনু মাটিতে নিক্ষেপ করে জংলী-জোয়ানদের আক্রমণ প্রতিহত করে চললো। বনহুরের বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে অল্পক্ষণেই কাবু হয়ে পড়লো ওরা। একজন তো মরার মত হয়ে উঠলো, গড়িয়ে পড়লো তার নাকেমুখে রক্ত।

উবু হয়ে পড়ে গেলো সে।

অপরজন বেগতিক দেখে তীরবেগে ছুটলো। অদূরেই সুউচ্চ পর্বতমালা। সেইদিকে এগিয়ে চললো সে।

বনহুর বিলম্ব না করে কুটিরে প্রবেশ করলো।

জংলীরাজ চীৎ হয়ে পড়ে আছে কুটিরের মেঝেতে।

মুখখানা তার হা হয়ে আছে।

চোখ দুটো গোলাকার, ঠিক ক্ষুদে বলের মত লাগছে। সে এক ভীষণ দৃশ্য। মাথার নরমুন্ডের মুকুট খুলে পড়েছে। ফুল্লরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে হতবাক হয়ে। চক্ষু তার স্থির, যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভেবে পাচ্ছে না কেমন করে এমন হলো। জংলীরাজকে ফুল্লরা বিশ্বাস করেছিলো, সে তার কোনো ক্ষতি করবে না বা করতে পারে না কিন্তু সেই জংলীরাজ যখন ফুল্লরার উপর অশুভ আক্রমণ চালালো তখন সে একেবারে হকচকিয়ে গেলো।

বনহুর ফুল্লরার হাত ধরে বললো—তাড়াতাড়ি চলো ফুল্লরা, এখানে আর এক মুহূর্ত না। ওরা এক্ষুণি সর্দারের সন্ধানে এসে আমাদের দেখলে......কাজেই চলো পালাতে হবে।

ফুল্লরা বললো—চলো বাপু।

ফুল্লরার মুখে বাপু শব্দটা বনহুরের কানে মধু বর্ষণ করলো কিন্তু অনুধাবন করার সময় এখন নেই, তাই ফুল্লরার হাত ধরে কাঠের কুটির থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করলো।

অন্ধকার।

গভীর জঙ্গল।

বনহুর আর ফুল্লরা ছুটছে।

পেছনে কুটিরের মধ্যে পড়ে রইলো জংলীরাজার প্রাণহীন অসার দেহ।

কিন্তু ওকি, একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে বনহুর আর ফুল্লরার কানে।

কোনো চোঙ বা সাইরেনের শব্দ বলে মনে হচ্ছে। পর্বত মালারই কোন্ অংশ থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর বললো—ফুল্লরা, যে শব্দটা আমরা শুনতে পাচ্ছি ওটা জংলীদের বিপদ সংকেতধ্বনি। এক্ষুণি জংলীদের ঝাঁক জঙ্গলের মধ্যে বন্যার পানির মত নেমে আসবে।

ফুল্লরা বললো—বাপু, আমি একটা পথ চিনি। ঐ পথে আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছতে পারবো সেখানে বেশ কিছু কাঠের ভেলা আছে। ঐ ভেলায় চেপে আমরা এ জঙ্গল ছেড়ে পালাতে পারেবো।

তাহলে চলো ফুল্লরা, আমরা সেই পথেই যাই।

বনহুরকে ফুল্লরা পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো, গভীর জঙ্গলের মধ্যে জমাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা দৌড়াতে লাগলো।

ওদিকে সেই অদ্ভুত শব্দ শোনামাত্র অগণিত জংলী মশাল হাতে পিঁপড়ার মত দলে দলে নিজ নিজ গুহা হতে বেরিয়ে এলো। ছড়িয়ে পড়লো তারা সমস্ত জঙ্গলে।

একদল যারা দলপতির কুটিরে প্রবেশ করেছিলো তারা দলপতির প্রাণহীন দেহ দেখে ভীষণ ক্ষেপে উঠলো এবং উন্মত্তের মত ছুটলো তীর-ধনু হাতে।

ততক্ষণে বনহুর আর ফুল্লরা গিয়ে পৌঁছে গেছে সমুদ্র তীরে।

তারাভরা আকাশ।

প্রদীপের মত মিট মিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা। তারই ক্ষীণালোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কয়েকটি কাঠের তৈরি নৌকা বাঁধা রয়েছে সেখানে।

অবশ্য সেগুলো আসলে নৌকা নয়, যেন এক একটা এবড়ো নেবড়ো কাঠের গুঁড়ির সমষ্টি।

ফুল্লরা বললো—চলো বাপু, আমরা ঐ নৌকায় উঠে পড়ি।

চলো ফুল্লরা। কথাটা বলে দ্রুত ফুল্লরা সহ বনহুর একটা ভেলা বা নৌকায় চেপে বসলো।

দাঁড় ছিলো দু'খানা। একটি বনহুর তুলে দিতেই অপরটি ফুল্লরা তুলে নিলো হাতে এবং তাড়াতাড়ি নৌকা ভাসিয়ে নিলো সমুদ্রের গভীর পানির দিকে।

ওদিকে জঙ্গলটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অগণিত মশালের আলো। ওরা বনহুর আর ফুল্লরার সন্ধান করে চলেছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। সর্দারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারা।

অন্ধকারে নৌকাখানা ঝুপঝাপ শব্দ করে এগুতে লাগলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে অল্পক্ষণেই ভেসে গেলো বেশ দূরে।

জংলীদের মশালের আলো সমুদ্রেতীরের দিকে ছুটোছুটি করে এগিয়ে আসছে।

বললো ফুল্লরা—ওরা যদি সমুদ্রতীরে এসে ওদের একখানা নৌকা কম দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে আমরা তাদের নৌকা নিয়ে পালিয়েছি। তখন বাকি নৌকাগুলোতে চেপে ওরা আমাদের সন্ধানে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বনহুর বৈঠা টানতে টানতে বললো— ওরা যেন আমাদের ধরতে না পারে তাই করতে হবে ফুল্লরা। নইলে মৃত্যু অনিবার্য, কারণ জংলীরা সর্দারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেই......কাজেই যাতে জংলীরা আমাদের ধরতে না পারে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

ফুল্লরা তখন তাকিয়ে আছে তীরস্থ মশালের আলোগুলোর দিকে।

আলোগুলো তীরে বিক্ষিপ্ত ছুটোছুটি করছে।

ওরা নিশ্চয়ই নৌকাগুলো লক্ষ্য করে দেখেনি, তাই নৌকায় চড়ে বসছে না।

ক্রমেই বনহুর আর ফুল্লরার নৌকাখানা সমুদ্রের বুকে অনেক দূরে চলে গেলো।

সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন তাদের সাহায্য করলো এই বিপদমুহূর্তে। ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাটি ক্ষীপ্রগতিতে চলে এসেছে বহু দূরে।

বনহুর আর ফুল্লরা লক্ষ্য করলো মশালের আলোকগুলো আবার যেন জঙ্গলের মধ্যে দলবদ্ধভাবে ফিরে যাচ্ছে।

ক্রমেই ক্ষুদে হয়ে আসছে মশালের আলোগুলো।

বনহুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো—যাক, এবারের মত বাঁচা গেলো।

সমস্ত রাত তারা বৈঠা চালালো।

অবশ্য ফুল্লরাকে বারবার নিষেধ করছিলো বনহুর, কারণ যে কোনো মুহূর্তে ফুল্লরা পড়ে যেতে পারে সমুদ্রের পানিতে। তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে।

বনহুর তাই সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখছিলো ফুল্লরার দিকে।

ভোর হবার কিছু পূর্বে ফুল্লরা নৌকার ধারে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। অনেক চেষ্টা করেও আর যে জেগে থাকতে পারলো না।

বনহুর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশে মেঘ নেই। তীরের কোনো চিহ্নও নজরে পড়ছে না।

এবার সে বৈঠা তুলে রাখলো, তারপর হাঁফ ছেড়ে আপন মনে বললো—খোদা, তুমি রক্ষাকর্তা, তাই এমনভাবে রক্ষা করে নিলে। নিজের জন্য চিন্তা নেই আমার, চিন্তা ফুল্লরাকে নিয়ে।

ফুল্লরাকে শিশির সিক্ত ফুলের মত লাগছে।

বড় মায়া হচ্ছে বনহুরের বেচারী ফুল্লরা কত না কষ্ট করেছে এতদিন। নেচে-গেয়ে তাকে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে। নরপশু মালোয়ার পাষন্ড আচরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে কত না সংগ্রাম করতে হয়েছে।

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, হঠাৎ তার নজর চলে যায় দূরে বহু দূরে।

একটা কিছু নজরে আসছে।

খালি চোখে তেমন বোঝা যাচ্ছে না, এ মুহূর্তে কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকায় ভালভাবে বুঝতেও পারছে না। ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুর সেই বস্তুটার দিকে।

ক্রমেই বস্তুটা স্পষ্ট হয়ে আসছে।

এবার বনহুর বুঝতে পারলো যে বস্তুটা এতক্ষণে সে দেখে আসছিলো তা একটি জাহাজের মাস্তুল।

ধীরে ধীরে জাহাজের মাস্তুলটা স্পষ্ট হয়ে আসছে, তার সঙ্গে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাহাজখানা।

আশায় আনন্দে বনহুরের মন দুলে উঠলো। এত সহজে তারা এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবে ভাবতে পারেনি। ফুল্লরার দিকে আবার তাকালো বনহুর অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। ওকে ডাকবে কিনা ভাবলো বনহুর, না আরও কিছুক্ষণ ঘুমাক। বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে বেচারী।

আবার তাকালো বনহুর জাহাজখানার দিকে।

এখন আরও ভালভাবে নজরে আসছে জাহাজখানা।

ক্রমান্বয়ে জাহাজখানা এগিয়ে আসছে।

এবার বনহুর ফুল্লরাকে জাগিয়ে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো জাহাজখানার দিকে—ঐ দেখো ফুল্লরা, একটি জাহাজ এদিকে আসছে, আমরা অচিরে উদ্ধার পাবো বলে আশা করছি।

ফুল্লরার চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো—ফুল্লরা জংলী সর্দার তোমার উপর অসৎ আচরণ করবে, এ আমি ভাবতে পারিনি, কারণ প্রথমে সে তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলো তাতে মনে হলো জংলীরাজ তোমার নৃত্যে মুগ্ধ কিন্তু......

ফুল্লরা ব্যথিত কণ্ঠে বললো—সেই বিশ্বাস আমারও ছিলো এবং সে-কারণেই আমি তার সম্মুখে যাবার সাহস পেয়েছি......

আচ্ছা ফুল্লরা, মালোয়া তোমাকে চুরি করে আনবার পর সোজা কি সে আত্নগোপন করেছিলো এই জঙ্গলে?

না।

তাহলে এখানে এলে কি করে?

আমি সঠিক কিছু বলতে পারবো না, তবে আমার মনে পড়ে যখন আমি একটু বড় হলাম তখন মালোয়া তার দলের দলপতিকে হত্যা করলো কৌশলে, তারপর সে নিজে দলপতি হলো কিন্তু এতেও সে স্বস্তি পাচ্ছিলো না। আমার কণ্ঠের নীলমনি হার এবং আমাকে হারানোর ভয় তাকে অস্থির করে তুললো তাই সে সর্বক্ষণ আমাকে আগলে থাকতো। কয়েকবার মালোয়া চেষ্টা করেছিলো আমার গলা থেকে নীলমনি হার আত্নসাৎ করার জন্য, আমি সে সুযোগ তাকে দেইনি......

তাই বুঝি আজও তোমার গলায় নীলমনি হার শোভা পাচ্ছে...

হ্যাঁ, তাই আজ নীলমনিহার আমার কণ্ঠে রয়েছে। আমি নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসি এটাকে।

তারপর?

তারপর মালোয়া আমাকে ফুসলিয়ে এটা যখন নিতে পারলো না, তখন সে আর এটা নেবার চেষ্টা না করে আমাকে সহ অজানার পথে পা বাড়ালো। একটু থেমে আবার ফুল্লরা বলতে শুরু করলো—কোথা থেকে কোথায় যে আমাকে নিয়ে চললো আমি জানি না। কতদিন হেঁটে, কতদিন গাড়িতে,

কতদিন জাহাজে, নৌকায়, তারপর আবার হেঁটে একদিন এই জঙ্গলে এসে আস্তানা গাড়লো। আমি কি করবো, অসহায় অবস্থায় রইলাম। সারাটা দিন বসে বসে কাঁদতাম। মালোয়া একদিন আমাকে সঙ্গে করে লোকালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। এ পথ, সে পথ এদিক ওদিক করে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু লোকালয়ের কোনো সন্ধান পেলো না।

তারপর কি করে লোকালয়ের সন্ধান পেলো সে? বললো বনহুর।

ফুল্লরা বললো—দীর্ঘ তিন দিন সন্ধান চালিয়ে মালোয়া একদিন লোকালয়ের সন্ধান পেলো এবং সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো সেখানে। তারপর আমাকে নাচতে-গাইতে বাধ্য করলো মালোয়া। পথে পথে নাচতে গাইতে হতো। এতে সে অনেক পয়সা পেতো কিন্তু আমি, আমি নিজকে বড় অসহায় মনে করতাম। কতদিন কত পুরুষের কুৎসিত ইংগিৎ সহ্য করেছি...কতজন আমাকে লক্ষ্য করে কত মন্দ কথা উচ্চারণ করেছে, টিপ্পনী কেটেছে। তাই আমি মাঝে মাঝে মালোয়ার অবাধ্য হয়েছি।

বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো ফুল্লরার কথাগুলো কিন্তু দৃষ্টি ছিলো তার জাহাজখানার দিকে।

জাহাজখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে তাদেরকে, তাই হয়তো উদ্ধারকল্পে এগিয়ে আসছে তারা।

বনহুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, ফুল্লরার কথায় আবার আবার সে সজাগ হয়ে উঠলো।

ফুল্লরা বলে চলেছে—মালোয়া সেজন্য আমাকে কত দিন না খাইয়ে রেখেছে, কতদিন নানাভাবে নির্যাতন করেছে, আমি নীরবে সব সহ্য করেছি কিন্তু পালাবার কোনো উপায় খুঁজে পাইনি।

এবার বনহুর বললো—এই গহন জঙ্গলে ভয়ংকর জংলীদের কাছ থেকে কি করে তোমরা এতদিন উদ্ধার পেয়ে এসেছো ফুল্লরা, আমি তাই জানতে চাই?

ফুল্লরা বললো—একদিন ওরা আমাকে আর মালোয়াকে আক্রমণ করে বসলো। ধরে নিয়ে গেলো হাতে মাজায় দড়ি বেঁধে দলপতির কাছে। সেদিন দলপতি যদি সদয় না হতো তাহলে জঙলীদের হাতে আমি আর মালোয়া নিহত হতাম। কি জানি কেন যেন সর্দার আমাকে আর মালোয়াকে হত্যা না করে বেঁধে রাখলো একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। একদিন দু'দিন কেটে

গেলো, ক্ষুধায় মরণাপন্ন অবস্থা হলো তখন আমি নিজকে বাঁচাবার জন্য হাতজোড় করে ওদের ভাষায় ক্ষমা চেয়ে নিজের মুক্তি কামনা করলাম।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি জংলীদের ভাষায় কথা বললে! বলতে পারলে?

হ্যাঁ, দু'দিনেই আমি ওদের কথার অনেক শব্দ আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। সর্দারের বিচারাসনের পাশেই আমাদের দু'জানকে আটকে রাখা হয়েছিলো, কাজেই অপরাধী জংলীরা কিভাবে ক্ষমা চায় আমি তা শিখে নিয়েছিলাম এবং সেই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলাম করুণভাবে। সর্দার আমাকে মুক্তি দিলো কিন্তু মালোয়াকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। আমি তখন নিজকে ভীষণ অসহায় মনে করলাম। কারণ এই গহন জঙ্গলে ভয়ংকর স্থানে মালোয়াই যেন আমার একমাত্র সম্বল, তাই ওকে বাঁচাবার জন্য নানাভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এলো—নাচ দেখিয়ে যদি ওকে মুক্ত করতে পারি!

তারপর তুমি বুঝি জংলী দলপতিকে নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করে মালোয়াকে খালাস করে নিয়েছিলে?

হাঁ, আমার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে দলপতি সেদিন মালোয়াকে মুক্তি দিয়েছিলো। সেদিন শুধু দলপতির দয়ায় আমি এবং মালোয়া জংলীদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে জংলীরা আমাদের কিছু বলতো না। অবশ্য আমরা যতদূর পারি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলেছি। তবে সব সময় একটা আতঙ্ক নিয়ে আমাদের কাটতো....

বনহুর বলে উঠলো—ফুল্লরা, দেখো দেখো জাহাজখানা কাছাকাছি এসে গেছে....

তাইতো! বললো ফুল্লরা। খুশিতে ফুল্লরার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

বনহুর আর ফুল্লরা উভয়েই তাকিয়ে রইলো জাহাজটার দিকে।

আশায়-উদ্দীপনায় বনহুর আর ফুল্লরার মন ভরে উঠলো। এই তো আর কিছুক্ষণ তাহলেই তারা ঐ জাহাজখানাতে আশ্রয় পাবে।

কিন্তু একি, জাহাজখানা এতক্ষণ তাদের দিকে এগুলেও এখন তাদের পাশ কেটে চলে চলে যাচ্ছে বলে মনে হলো। জাহাজের স্পীড নিতান্ত কম, তাই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো জাহাজে কোনো জনমানুষ নজরে পড়ছে না। জাহাজখানা যেন আপন ইচ্ছায় এগিয়ে চলেছে।

বনহুর ফুল্লরাকে বললো—ফুল্লরা, বৈঠা হাতে নাও। যেমন করে হোক জাহাজখানাতে আশ্রয় নিতে হবে। তবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, জাহাজের ডেকে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কিন্তু কেন'র জবাব বনহুরকে কে দেবে। নিজেও বনহুর কেন'র জবাব খুঁজে পেলো না।

ফুল্লরা বৈঠা চালাতে শুরু করলো।

বনহুর নিজেও বৈঠা মারছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বৈঠা চালাতে লাগলো। এ ব্যাপারে সমুদ্রের ঢেউগুলো তাদের সাহায্য করলো সর্বতোভাবে।

কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই বনহুর আর ফুল্লরা সহ নৌকাখানা পৌঁছে গেলো জাহাজটার পাশে। জাহাজের গায়ে ছিলো একটা ঝুলন্ত শিকল।

বনহুর কৌশলে শিকলটা ধরে ফেললো এবং নৌকার সঙ্গে আটকে নিলো সতর্কতার সঙ্গে। ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো—এসো ফুল্লরা, আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমার কাছে এসো।

এক হাতে বনহুর জাহাজের ঝুলন্ত শিকল আঁকড়ে ধরে আছে, অপর হাতে ফুল্লরাকে বেষ্টন করে ধরে শূন্যে ঝুলে পড়লো। তারপর অতি কষ্টে ফুল্লরাসহ জাহাজখানার ডেকে উঠে পড়লো।

জাহাজের ডেকে ফুল্লরাসহ বনহুর উঠে দাঁড়ালো পর তারা রীতিমত হাঁপাতে লাগলো, কারণ নৌকা থেকে চলন্ত জাহাজে উঠা এক ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

ফুল্লরাকে বনহুর ধরে বসিয়ে দিয়ে নিজে হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেললো। সমুদ্রের ঢেউয়ের পানিতে ভিজে চুপসে গেছে বনহুর আর ফুল্লরার দেহ।

সামান্য সময় জিরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর, তাকালো সমস্ত জাহাজখানার ভিতরে। কিন্তু কোনো জনপ্রাণী তার নজরে পড়লো না।

অবাক হলো সে।

বললো বনহুর—ফুল্লরা, আমি অবাক হচ্ছি একটি জনপ্রাণীও জাহাজে দেখছি না। জাহাজখানা যেন আপনাআপনি চলছে।

ফুল্লরা আর বনহুর এবার এগুতে লাগলো।

মস্তবড় জাহাজখানা।

প্রশস্ত ডেক।

রেলিং-ঘেরা ডেক দিয়ে কিছুদূর এগুতে পাশাপাশি কয়েকটা ক্যাবিন।

বনহুর একটা ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা মারতেই দরজা খুলে গেলো।

দরজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলো একটি লোক মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় বসে আছে চেয়ারে হেলান দিয়ে, দৃষ্টি তার সম্মুখে, স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে সে।

বনহুর বললো—আমি আসতে পারি?

কোনো জবাব দিলো না লোকটা।

বনহুর পুনরায় বললো—ভিতরে আসতে পারি কি? আমরা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি...

কোনো উত্তর দিলো না লোকটা।

ফুল্লরা বনহুরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর এবার ফুল্লরার দিকে ফিরে বললো—লোকটা কি কানে শুনতে পাচ্ছে না? ও আমাদের দেখতে পাচ্ছে কিন্তু কথাটা বলে বনহুর লোকটার পাশে গিয়ে দেহে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—এই যে শুনুন...

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেলো, লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সামনের টেবিলটার উপরে।

চমকে উঠলো বনহুর।

ফুল্লরা ভয়ার্ত চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢাকলো।

বনহুর আর ফুল্লরা কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে পড়লেও অল্পক্ষণেই বনহুর স্বাভাবিক হয়ে বললো—ফুল্লরা, এই সামান্য ব্যাপারে ভয় পেলে চলবে না। এ জাহাজে আমরা আরও কিছু ভয়াবহ দেখবো বা ঘটবে বলে মনে করছি। আমাদের সেই সব ভয়াবহ মুহূর্তগুলোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ফুল্লরার কাঁধে হাত রাখলো বনহুর।

ফুল্লরার মনে হয়তো সাহস এলো কিছুটা, সে চোখ থেকে হাত সরিয়ে তাকালো পুনরায় সেই প্রাণহীন দেহটার দিকে।

বনহুর বললো—আশ্চর্য বটে! চলো ফুল্লরা, দেখি পাশের ক্যাবিনে আমাদের জন্য কি ভয়াবহ দৃশ্য রয়েছে।

ফুল্লরাসহ বনহুর বেরিয়ে এলো ঐ ক্যাবিন থেকে। পাশে আরও দুটি ক্যাবিন, বনহুর আর ফুল্লরা দ্বিতীয় ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

দরজা কিছুটা খোলা অবস্থায় ছিলো।

বনহুর আর ফুল্লরা দরজার পাশে দাঁড়াতেই ভিতরে নজর পড়লো।

আঁতকে উঠলো বনহুর আর ফুল্লরা।

দরজার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়লো কয়েকটি মনুষ্য-দেহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। দরজা খুলে আরও বিস্মিত হলো—আট নয় জন লোক মৃত পড়ে আছে মেঝেতে। আশ্চর্য, তাদের দেহে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু চোখ দুটো মেলে আছে, যেন ওরা জীবন্ত।

ফুল্লরার দু'চোখে ভয়ার্তভাব ফুটে উঠেছে, একি দৃশ্য সে দেখতে পাচ্ছে, এ সব কি স্বপ্ন না সত্য...

বনহুর ফিরে তাকালো ফুল্লরার দিকে, বললো সে—এতেই ভীত হয়োনা ফুল্লরা। জাহাজে দেখছি এক গভীর রহস্যের বেড়াজাল...চলো দেখি পাশের ক্যাবিনে।

ফুল্লরা যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বনহুরের পিছু পিছু এগিয়ে চললো।

তৃতীয় ক্যাবিনের দরজা বন্ধ ছিলো না, দরজার নিকটে পৌছতেই একটা সুস্বাদু গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো। কোনো উন্নত মানের খাবারের গন্ধ।

বনহুর আর ফুল্লরা তৃতীয় ক্যাবিনে প্রবেশ করে শুধু অবাক হলো না, খুশি হলো ভীষণ। ক্যাবিনের মাঝামাঝি একটি টেবিল, টেবিলে নানাবিধ খাবার থরে থরে সাজানো। সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যগুলো কেউ স্পর্শ করেনি। খাবারগুলো দেখেই অনুমান করা যায়। মাঝে একপাশে ঝুড়িভর্তি ফলমূল রয়েছে।

বনহুর আর ফুল্লরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, তাই বনহুর আনন্দভরা কণ্ঠে বললো—যাক্ ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে নেওয়া যাক এবার।

ফুল্লরার চোখ দুটোও খুশিতে ভরে উঠেছে, ভুলে গেলো সে প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্যাবিনে সেই মৃত ব্যক্তিদের কথা। বললো ফুল্লরা—আমাকে খেতে দিন বাপু। আমি খাবো!

বললো বনহুর—নিশ্চয়ই আমরা এসব খাবো। কিন্তু খাবার পূর্বে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এগুলো কোনো রকম বিষাক্ত কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরার চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে এলো। সত্যিই সে খাবারগুলো দেখে ভীষণ আনন্দিত হচ্ছিলো। এখন সব আনন্দ যেন নিমিষে উধাও হয়ে গেলো।

বনহুর নিজেও কম ক্ষুধার্ত ছিলো না। তবু ধৈর্য সহকারে এসে দাঁড়ালো সে খাবারভর্তি টেবিলটার পাশে।

ফুল্লরাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখছে সে বনহুরের কার্যকলাপ—কি করে সে।

বনহুর তুলে নিলো একটি খাবারের পাত্র এবং নাকের কাছে ধরলো, বারবার সে নাকে দিয়ে গন্ধ গ্রহণ করতে লাগলো। কিছু সময় নাকে শুঁকে নিয়ে বললো—খেতে পারো ফুল্লরা, এই খাদ্যগুলো সম্পূর্ণ নির্দোষ আছে।

ফুল্লরার মুখমন্ডল খুশিতে ভরে উঠলো।

বনহুর কিছু খাবার ফুল্লরার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে নিজে কিছু খাবার হাতে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো। খাবারগুলো একেবারে টাটকা না হলেও পঁচে যায়নি বা একেবারে নষ্ট হয়ে পড়েনি।

বনহুর আর ফুল্লরা প্রাণভরে খাদ্যগুলো খেলো। ফলমূল ছিলো প্রচুর, তাও তারা যা পারলো খেয়ে নিলো।

ভীষণ ক্ষুধার জ্বালা হতে রেহাই পেলো তারা।

এবার হাত-মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে বেরিয়ে এলো সেই ক্যাবিন থেকে। দরজাটা বন্ধ করে দিলো বনহুর স্বহস্তে। কারণ খাবার এবং ফলমূল, পানীয় এসব তাদের পুনরায় প্রয়োজনে আসতে পারে।

বললো বনহুর—খাবারগুলো তৈরি করা হয়েছিলো, কিন্তু খাবার পূর্বেই কোনো দুর্ঘটনায় জাহাজের যাত্রীরা মৃত্যুবরণ করেছে...

হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। বললো ফুল্লরা।

বনহুর বললো—খাদ্যদ্রব্যগুলো একেবারে আমাদের সভ্যসমাজের খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে কোনো অংশে তফাৎ ছিলো না, তাই আমরা তা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হলাম।

ফুল্লরা বললো—কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে জাহাজখানার মধ্যে কোনো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সে কথা মিথ্যা নয় ফুল্লরা। এসো দেখি জাহাজের খোলের ভিতরে আমাদের জন্য আরও কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য অপেক্ষা করছে।

ফুল্লরা সহ বনহুর পা বাড়ালো অপরদিকে।

বললো ফুল্লরা—লোকগুলো মৃত্যুবরণ করেছে অথচ কারও দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না।

হাঁ ফুল্লরা, এ কথা তুমি ঠিক বলেছো। মৃত ব্যক্তিগুলোর দেহে কোনো ক্ষত নেই অথচ সত্যি বড় রহস্যময় ব্যাপার। তবে এ জাহাজের মধ্যেই এর গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। এসো দেখা যাক....

ফুল্লরা সহ বনহুর জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। একি, কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। তবে কি সবাই গিয়ে হাজির হয়েছিলো জাহাজের সেই ক্যাবিনে! যে ক্যাবিনে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে সবগুলো ব্যক্তি...

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, হঠাৎ ফুল্লরা বলে উঠলো—ঐ দেখুন ওখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে তাকালো বনহুর, তাই তো একটি লোক এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা রেলিংয়ে হেলান দিয়ে। বনহুর পা বাড়ালো লোকটার দিকে। ভাবলো সে, যা হোক একটা লোকের সাক্ষাৎ তবু পাওয়া গেলো। কিন্তু লোকটা একমনে ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছে। তাকে সে কি ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে।

বনহুর লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিছুটা এগুনোর পর একটু কেশে নিলো, লোকটা তবু ফিরে তাকালো না। আশ্চর্য হলো বনহুর, এ আবার কেমন কথা। লোকটা কি তবে শুনতে পাচ্ছে না কিছু?

লোকটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লো বনহুর, তারপর জোরে একটু কাশলো, তবু লোকটা নীরব। বনহুর ওর কাছে গিয়ে পেছনে দাঁড়ালো তবু সে নীরব।

এবার বনহুর ডাকলো—শুনুন!

কিন্তু কই, কোনো জবাব দিলো না লোকটা।

বনহুর এবার লোকটার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো—এই যে শুনুন!

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

চমকে পিছু হটলো বনহুর।

একি! বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো।

ফুল্লরা দৌড়ে এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। তার চোখে-মুখেও উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। এ আবার কেমন কথা, লোকটা তাহলে প্রাণহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলো?

বনহুর আর ফুল্লরা উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে। কেউ যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

যত সময় যাচ্ছে ততই বিস্মিত হতবাক হচ্ছে বনহুর আর ফুল্লরা। একি ভুতুড়ে কান্ড, সবাই মৃত ব্যক্তি—কি ব্যাপার! কেউ এদের হত্যা করেছে, না এরা আপনা-আপনি মৃত্যুবরণ করেছে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

বনহুর লোকটাকে উল্টো-পাল্টে দেখলো—না, কোথাও ওর ক্ষত নেই।

বললো বনহুর—আশ্চর্য!

হাঁ, আশ্চর্য কান্ড। সত্যি আমার বড় অস্বস্তি লাগছে।

বনহুর ফুল্লরা সহ পা বাড়ালো অন্যদিকে।

জাহাজখানা বিরাট, আনেকগুলো ক্যাবিন। এক একটা ক্যাবিন এক এক ধরনের। বনহুর আর ফুল্লরা নিচে নেমে এলো এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে সব দেখতে লাগলো।

নিচের ডেকে ক'জন কুলি জাহাজের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর আর ফুল্লরা তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—এরা কি সত্যি ঘুমাচ্ছে না চিরনিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে?

কিন্তু কে তার জবাব দেবে!

ফুল্লরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

বনহুর ওদের গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো কিন্তু কেউ জাগলো না, সবাই চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠলো। এ কি করে সম্ভব? একটা জাহাজে শ্রমিক মজুর খালাসি সারেং ক্যাপ্টেন কতকি থাকে এবং তারা নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকে। জাহাজে এ কি বিস্ময়, যে যেখানে যেমন আছে তেমনি মৃত্যুবরণ করেছে। কারও শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

জাহাজের ইঞ্জিনকক্ষের দিকে এগুতে নজরে পড়লো দু'জন খালাসি কিছু নিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তারা বোঝা কাঁধে যেমনি দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন মাটির তৈরি পুতুল।

বনহুর নিকটে পৌঁছে ওদের শরীরে মৃদু ধাক্কা দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলো খালাসি দুজন রেলিংয়ের পাশে।

জাহাজ চলছে।

জাহাজ কি তাহলে সম্পূর্ণ আপন মনেই চলেছে? জাহাজের গতি দেখে ঠিক তাই মনে হচ্ছে।

ইঞ্জিনকক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলো বনহুর; কারণ ইঞ্জিনকক্ষে কোনো জনপ্রাণী নেই। জাহাজের ইঞ্জিন আপনা আপনি চলছে। বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে ভালভাবে লক্ষ্য করলো, কিন্তু একি, ইঞ্জিন তো ঠিকভাবেই চলেছে। জাহাজের হ্যান্ডেল আপনা আপনি চলছে, যেন কোনো অদৃশ্য হাত জাহাজখানাকে চালনা করছে বলে মনে হলো।

জাহাজের কলকজাগুলো চলন্ত অবস্থায় যেভাবে চলে ঠিক সেইভাবেই কাজ করছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে, কলকব্জাগুলো যেন অদৃশ্য কোনো হাতে পরিচালিত হচ্ছে। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার। এতোক্ষণ বনহুর আর ফুল্লরা মনে করেছিলো জাহাজখানা দিশে হারার মত আপনা আপনি চলছে কিন্তু তা নয়, কোনো বিশেষ শক্তি দ্বারা ইঞ্জিন চালিত হচ্ছে।

তাবে কি ক্যাপ্টেন তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করছে বা কোনো কৌশলে...বনহুর দ্রুত সম্মুখের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

ঠিক ইঞ্জিনের পাশেই ছিলো সিঁড়িটার, তাই বনহুর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেলো। সে জানে উপরেই রয়েছে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিন।

মুহূর্তের জন্য বনহুর ভুলে গেলো ফুল্লরার কথা।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতেই সামনেই ক্যাপ্টেনের ক্যাবিন নজরে পড়লো।

বনহুর প্রবেশ করতেই দেখলো ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছে, সম্মুখের গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি জলরাশির দিকে।

বনহুর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—ক্যাপ্টেন, ভিতরে আসতে পারি কি?

একি, ক্যাপ্টেন নীরব!

ফিরেও তাকালেন না তিনি।

বনহুর এবার ভিতরে প্রবেশ করে কাঁধে হাত রাখলো ক্যাপ্টেনের। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন প্রস্তুরমূর্তির মত বনহুরের দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

বনহুর অবাক হলো তবে একেবারে বিস্মিত হলো না, কারণ এটাই প্রথম প্রাণহীন দেহ নয়। এর পূর্বে বেশ কিছু সংখ্যক মৃতদেহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। এ জাহাজে এসে যে সময়টুকু তাদের কেটেছে এক বিভীষিকাময় অবস্থায় কেটেছে কিন্তু একি রহস্য......বনহুর ক্যাপ্টেনের

প্রাণহীন দেহটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর ক্যাবিনের জিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। কোন 'ক্লু' খুজে পায় কিনা।

হঠাৎ মনে পড়লো ফুল্লরাকে একা নিচে রেখে আসা ঠিক হয়নি। এতক্ষণ তার কথা মনেই ছিলো না। বনহুর একটুও দেরী না করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। কিন্তু একি, ফুল্লরা কোথায়? বনহুর চারদিকে তাকিয়ে ফুল্লরার সন্ধান করতে করতে ডাকতে লাগলো—ফুল্লরা, ফুল্লরা, ফুল্লরা......ফুল্লরা......

ফুল্লরার কোনো চিহ্নও নজরে পড়লো না।

বুকটা ধক্ করে উঠলো বনহুরের।

ফুল্লরাকে কেন একা রেখে সে উপরে চলে গিয়েছিলো? কেন সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি? কেন সে এমন কাজ করলো? একি বিভ্রাট ঘটলো, ফুল্লরা কোথায় গেলো, এই সামান্য কয়েক মিনিট বইতো নয়!

বনহুর আবার ডাকতে শুরু করলো চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে।

কিন্তু তবু ফুল্লরার কোনো জবাব এলো না।

বনহুর হন্তদন্ত হয়ে ফুল্লরাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। গোটা জাহাজ চষে ফেললো বনহুর, তবুও কোথাও তার সন্ধান মিললো না শেষ পর্যন্ত।

ক্লান্ত হয়ে পড়লো বনহুর।

যে ক্যাবিনেই প্রবেশ করে শুধু মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ছে না।

বিস্ময় আর বিস্ময়—একি বিস্ময়কর ঘটনা। ফুল্লরা গেলো কোথায়?

❑

সেই জাহাজে চারদিন চাররাত্রি কেটে গেলো। বনহুর অধীর হয়ে উঠলো, এও কি করে সম্ভব। জাহাজখানা একটানা চলেছে। কোথায় তীর কে জানে। কিন্তু আশ্চর্য, জাহাজখানা যেন কোনো অদৃশ্য হাতে চালিত হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য এবং দুঃখজনক ফুল্লরার নিরুদ্দেশ, ফুল্লরা এই জাহাজ থেকে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো? কে বা কারা তাকে সরিয়ে ফেললো? ফুল্লরা তো জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে যায়নি?

হয়তো তাই হবে, নাহলে সে গেলো কোথায়।

সমস্ত জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে বনহুর। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে সন্ধান চালানো বাকি রয়েছে।

বনহুর এ ক'দিন তৃতীয় ক্যাবিনের বাসি খাবারগুলো ক্ষুধার জ্বালায় খেতে বাধ্য হয়েছে। ফলমূল ছিলো তাও সে খেয়েছে। এতে পেটের ক্ষুধা মিটেছে কিন্তু দুঃখ-ব্যথা বেড়েছে। ফুল্লরাকে হারানোর ব্যথা তাকে ভীষণ ব্যথিত করে তুলেছে। ভাগ্যক্রমে তাকে পেয়েছিলো কিন্তু তাকে আবার এমন করে হারাতে হবে, একথা ভাবতেও পারেনি বনহুর।

মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো সে।

কেন সে ফুল্লরাকে রেখে উপরের ডেকে চলে গিয়েছিলো, তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াটা ভীষণ ভুল হয়েছে। যেঁ ভুলের কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না বনহুর।

শুধু জাহাজ আর অথৈ জলরাশি।

আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া কিছু নজরে পড়ছে না।

এ ক'দিন বনহুর জাহাজের মৃতদেহগুলি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। বনহুর জানে, তাকে এ জাহাজে হয়তো অনেক দিন কাটাতে হবে। ততদিনে মৃতদেহগুলো পঁচে দুর্গন্ধ বেরিয়ে পড়বে তখন জাহাজে বাস করা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এ কারণেই বনহুর মৃতদেহগুলো সব সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

গোটা জাহাজখানা যেন তার।

কেউ নেই তার সঙ্গী বা সাথী।

শুধু সমুদ্রের জলরাশির গর্জন আর জাহাজের একটানা ঝক ঝক শব্দ।

বনহুর বড় একা মনে করে নিজেকে।

জাহাজের সর্বত্র সে নীরবে ঘুরে বেড়ায়।

কখনও ডেকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সীমাহীন জলারাশির দিকে তাকিয়ে। কখনও খাবারে ভরা ক্যাবিনটার একটা শূন্যে চেয়ারে বসে ঝিমাতে থাকে। কখনও পায়চারী করে রেলিংয়ের ধারে।

কখনও তাকিয়ে থাকে উদাস নয়নে প্রশস্ত আকাশের দিকে।

সময় যেন কাটতে চায় না।

কিন্তু কোনো উপায় নেই।

সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে জাহাজখানা কোন্ দিকে চলেছে। সূর্য এখন বনহুরের দিকদর্শন যন্ত্রের কাজ করছে।

কোন্‌দিকে গেলে তীর বা বন্দর পাওয়া যাবে তাও জানে না বনহুর। দিকহারা জাহাজখানা সে একমাত্র যাত্রী...ফুল্লরা ছিলো সেও হাওয়ায় উবে গেলো যাদুমন্ত্রের মত।

এক সপ্তাহ কেটে গেলো।

খাবার প্রচুর রয়েছে কিন্তু সব পচে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে। ফলমূল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর দু'চার দিন চলতে পারে।

বনহুরের নিজের চিন্তার চেয়ে বেশি চিন্তা ফুল্লরার। আরও একটা চিন্তা তাকে মর্মান্তিকভাবে ব্যথিত করে তুলছে, তা হলো দিপালী। না জানি সে কেমন আছে, কি ভাবছে। সৌরজগতের মানুষ এখন দিপালী।

গভীর রাত।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর, তার চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। আকাশে কোনো তারা নেই। কেমন যেন থমথমে ভাব বিরাজ করছে গোটা জাহাজে।

জমাট অন্ধকারে বনহুরের চারপাশে এসে যেন ভিড় জমিয়েছে জাহাজের সেই প্রাণহীন মানুষগুলোর অশরীরী আত্মা। তারা যেন ফিস ফিস করে কিছু বলছে।

বনহুর আপন মনে তাকিয়ে আছে নীরবে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর, অশরীরী আত্মার নিঃশ্বাস তার কানে প্রবেশ করছে। তবে কি সত্যি কোনো আত্মা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সম্পূর্ণ জনপ্রাণীহীন জাহাজে মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ এলো কি করে! তবে কি সত্যই অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে? কোনো দিন বনহুর বিশ্বাস করেনি যে, কোন ভূতপ্রেত বা ঐ ধরনের কিছু আছে এ জগতে।

বনহুরের কাছে কোনো অস্ত্র নেই।

তবু সে হাতখানাকে মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিলো কিন্তু ফিরে তাকাবার পূর্বেই একটা দ্রুত পদশব্দ মিশে গেলো অন্ধকারে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে অন্ধকারে এগিয়ে চললো শব্দ লক্ষ্য করে।

যেদিক থেকে শব্দটা এসেছিলো সেইদিকেই চললো সে দ্রুত পদক্ষেপে।

কিন্তু অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

ভারী বুটের শব্দ বলে মনে হলো।

বনহুর যত দ্রুত এগুলো তার চেয়ে বেশি দ্রুত সরে গেলো পদশব্দটা।

অন্ধকার না হলে স্পষ্ট বোঝা যেতো বনহুরের মুখমন্ডলের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে। বনহুর আর অগ্রসর না হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বনহুর ভাবতে লাগলো। কে এই অদৃশ্য মানুষ, যার পদশব্দ সে নিজ কানে শুনতে পেলো। জাহাজের প্রতিটি জায়গা সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু কোনো জনপ্রাণীর সন্ধান বনহুর পায়নি, তবে এ কার পদশব্দ? শুধু পদশব্দই নয়, নিঃশ্বাসের শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে।

দিনের আলোতে কত না খুঁজেছে তবু কোনো সন্ধান সে পায়নি তবে কি অশরীরী আত্মার তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ আর তাদেরই পদধ্বনি।

বনহুর অন্ধকারে ফিরে আসে পূর্বের সেই স্থানে যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো।

আরও দুটো দিন কেটে গেলো।

বনহুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সময় যেন কাটছে না তার।

এরপর আর কোনো অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটেনি। দুটো দিন বেশ নিশ্চিন্তে কেটে গেলো কিন্তু খাবার আর পানি শেষ হয়ে এসেছে।

আর দু'চার দিনের মধ্যে যদি জাহাজখানা কোনো তীরে না ভিড়ে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। বনহুর পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

আজকের রাতটা কেমন কাটবে কে জানে।

সারা দিনটা কেটে যায় সমুদ্রের ঢেউ আর নীল আকাশ দেখে দেখে, রাত যেন নেমে আসে বিভীষিকাময় হয়ে। প্রতিদিনের মত আজও রাত আসে।

বনহুর আজ একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বসে ভাবছে কত কথা। আকাশে অসংখ্য তারকারাজি পিট্ পিট্ করে জ্বলছে।

আজ ডেকে তেমন জমাট অন্ধকার নেই।

তারাভরা আকাশের হাল্কা আলোতে জাহাজের ডেকখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেদিন বনহুর একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়েছিলো। এ জাহাজে আসার পর যদিও বনহুরের বিস্ময়ের সীমা ছিলো না, তবু এ যে নতুন এক বিস্ময়। একটি ক্যাবিনে প্রবেশ করে বনহুর দেখতে পেয়েছিলো একটা টাটকা ফলের খোসা। কেউ যেন সবেমাত্র ফলটার খোসা ছাড়িয়ে খেয়েছে।

কিন্তু কে ফল খেলো?

জাহাজ তো জনপ্রাণীহীন। সে ছাড়া আর তো কেউ নেই।

কিন্তু ফলের খোসা চাকু দিয়ে টাটকা ছাড়ানো হয়েছে বলে মনে হয়েছিলো তার।

তাহলে কি ফুল্লরা জাহাজের কোথাও লুকিয়ে আছে। ফুল্লরাই কি তবে ফলটা চাকু দিয়ে ছাড়িয়ে খেয়েছিলো? না না তা হয় না, ফুল্লরা কিছুতেই আত্নগোপন করতে পারে না, কারণ এই রহস্যময় জাহাজে সে নিজকে একা রাখতে পারে না। তবে কি মনের ভুল, ঐ ফলের খোসা কি তবে অনেক দিনের আগের? হয়তো তাই হবে।

ঠিক এমন সময় জাহাজখানা ভীষণভাবে দু'লে উঠলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো বনহুর।

বনহুর মনে করলো জাহাজখানা কোনো ভাসমান শক্ত বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, জাহাজখানা আবার ঠিকভাবে চলতে শুরু করলো।

বনহুর এবার ক্যাবিনে গিয়ে আশ্রয় নিলো। ঐ ক্যাবিনটার মধ্যে পাশাপাশি দুটো পরিষ্কার শয্যা ছিলো বিশ্রাম এবং ঘুমাবার জন্য।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে শয্যা গ্রহণ করলো বনহুর।

আজ বনহুর অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ক'দিন একেবারে চোখে ঘুম আসেনি, নানা চিন্তায় সর্বক্ষণ অস্থির ছিলো মনটা। আজ কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি সে।

হঠাৎ ভীষণ ধাক্কা খেয়ে জাহাজখানা থেমে যাওয়ায় ঝাঁকুনি লাগলো। জেগে উঠলো বনহুর, তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

সূর্য তখন পূর্বাকাশের হাত কয়েক উপরে উঠে এসেছে। গোটা ডেকটা আলো ঝলমল করছে।

জাহাজখানা থেমে গেছে একেবারে।

কিন্তু কোনোদিকে তীর বা মাটির চিহ্ন নেই।

বনহুর সিড়ি বেয়ে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের দিকে উঠে গেলো। যেখান থেকে দূরে বহু দূরে নজর পড়বে। বনহুর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই মেঝেতে নজর পড়লো। একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট মেঝেতে পড়ে আছে, তা থেকে তখনও ধুঁয়া বেরুচ্ছে।

বনহুরের বিস্ময় চরমে উঠলো।

নির্জন জনপ্রাণীহীন জাহজে জ্বলন্ত সিগারেট এলো কি করে? উবু হয়ে সিগারেটটা তুলে নিলো হাতে। সিগারেটটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো ভালভাবে।

এবার তো সন্দেহ নেই—একেবারে সত্য।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে এবং তা অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। কেউ যেন এইমাত্র সিগারেটটা পান করছিলো, তার পদশব্দে সিগারেট নিক্ষেপ করে সরে পড়েছে কিন্তু মানুষ এলো কি করে এ জাহাজে?

বনহুর নিপুণভাবে সন্ধান করে চললো প্রতিটি ক্যাবিনে, প্রতিটি স্থানে, যদি কারো সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্যাবিনের মেঝেতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালো। সম্মুখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বনহুর দূরবীক্ষণ দিয়ে অনেক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কোনো তীর বা সমুদ্রের কিনারা নজরে পড়ছে না শুধু জলরাশি থৈ থৈ করছে। কিন্তু আশ্চর্য, জাহাজখানা কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো! বনহুর ইঞ্জিনরুমে প্রবেশ করে ভালভাবে লক্ষ্য করছে। ইঞ্জিরুমের মেশিনগুলো যেন কোনো অদৃশ্য হাতের ইংগিতে থেমে গেছে।

তবে কি এই জাহাজের কোনো গোপন স্থান আছে, যে স্থানে কেউ আত্মগোপন করে জাহাজখানাকে চালনা করছিলো।

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলো কেন?

তবে কি জাহাজখানার নিচে কোনো ডুবু দ্বীপ বা ঐ ধরনের কিছু আছে?

বনহুর ভালভাবে দূরবীক্ষণে দেখে নিলো জাহাজ যে স্থানে থেমে গেছে সেই স্থানের সম্মুখভাগ। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউ ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। হঠাৎ বনহুরের মুখমন্ডলে একটা উৎফুল্ল ভাব ফুটে উঠলো। ফিরে এলো সে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে।

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরাটা থেকে তখনও ধুয়া বেরুচ্ছে। বনহুর সিগারেটটা টেবিলের এক কোণায় রেখেছিলো। সিগারেটের টুকরাটা তুলে নিলো হাতে। হঠাৎ নজর পড়লো একটি নতুন সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের একপাশে রয়েছে।

কেমন যেন ভৌতিক ব্যাপার।

টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট এলো কি করে?

বনহুর সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করে নিলো। ভাবলো জ্বলন্ত সিগারেট থেকে সিগারেটে অগ্নিনসংযোগ করবে কিনা, ঐ

সময় মনে পড়লো টেবিলে যে মৃত ব্যক্তিকে সে প্রথম দেখেছিলো, তার আংগুলে ছিলো অর্ধদগ্ধ সিগারেট। বনহুর লক্ষ্য করেছিলো কিন্তু তখন তেমন কোনো সন্দেহ আসেনি মনে। এই মুহূর্তে বনহুরের মনের আকাশে দৃশ্যগুলো ভেসে উঠতে লাগলো এবং সন্দেহ এলো মনে। সিগারেটের ধুঁয়ায় এমন একটা বিষ মেশানো আছে যা পান করবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো বুট দিয়ে, কারণ বেশিক্ষণ ঐ সিগারেটের ধূঁয়া নাকে প্রবেশ করলে ক্ষতি হতে পারে।

এবার বনহুর বিলম্ব না করে ইঞ্জিন ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালো। নিশ্চয়ই ইঞ্জিনের আশেপাশেই রয়েছে গভীর রহস্য।

ইঞ্জিনরুমে প্রবেশ করে মেঝের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াতেই ক্যাবিনের দরজা আলগোছে বন্ধ হয়ে গেলো।

চমকে উঠলো বনহুর কিন্তু সে মোটেই ঘাবড়ালো না। কারণ রহস্যময় জাহাজের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রথম পর্ব সে যেন খুঁজে পেলো।

বনহুর এগিয়ে গেলো অপর দরজার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

তবে কি জাহাজের কোনো গোপন অংশে অবস্থান করে কোনো একটা শক্তি কাজ করছে? নিশ্চয়ই তাই।

বনহুর কিছু ভাবার পূর্বেই ইঞ্জিনের মেঝের কিছু অংশ নিচে নামতে লাগলো। প্রায় অর্ধেক পথ নিচে এসে মেঝেটো থেমে গেলো।

বিস্মিত বনহুর তাকিয়ে দেখলো, তার চারপাশে দেয়াল কিন্তু দু'পাশের দেয়ালে সূতীক্ষ্ণ ফলা ঝক ঝক করছে। যদিও জাহাজের খোলসের মধ্যে এ ঘটনা ঘটছে, তবু আলো রয়েছে সেখানে, তাই বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

দু'দিক থেকে দেয়ালটা ক্রমেই চেপে আসছে।

সূতীক্ষ ফলাগুলো কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্ধ হবে তার দেহে। বনহুর তাকালো উপরের দিকে। উপরে কোনো দেয়াল বা ছাদ ছিলো না, ছাদসহ নেমে এসেছে নিচে জাহাজের খোলসের মধ্যে।

বনহুর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাকালো।

দু'পাশ থেকে সূতীক্ষ্ণ ফলা সহ দুটো দেয়াল ক্রমান্বয়ে চেপে আসছে।

একেবারে কাছে এসে গেছে।

বনহুর এবার বিলম্ব না করে সূতীক্ষ্ণ ফলার উপর পা দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে এলো শূন্য ছাদে। ছাদের যে অংশে ইঞ্জিন রয়েছে সেই অংশে দাঁড়ালো সে অতি সাবধানে।

বয়লারের গনগনে তাপ তার দেহে লাগছে। আর একটু, তাহলে ফোস্‌কা পড়ে যাবে। অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলে বনহুর।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ইঞ্জিনের পাশের একটা পাইপ থেকে অবিরাম ধূয়া বের হতে থাকে। নিশ্চয়ই এ গ্যাস নাকেমুখে প্রবেশ করলে মৃত্যু ঘটবে বা ঘটতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তাকালো নিচের দিকে।

সে উপরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে সূতীক্ষ্ণ ফলাগুলো এসে এক হয়ে গেছে। এতক্ষণ বনহুর নিচে ঐ খোলসের মধ্যে থাকলে ঐ ভয়ঙ্কর ছোরা বা সুতীক্ষ্ণ ফলাগুলো তার দেহে এপাশ ওপাশ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতো। কিন্তু তার সৌভাগ্য যে, এখনও সে জীবিত আছে।

বনহুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

নাকেমুখে ধুঁঃা প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

বনহুর ইঞ্জিনরুমের বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য দ্রুত পা বাড়াতেই সম্মুখের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। পিছু হটতে গিয়ে পড়ে গেলো বনহুর হোচট খেয়ে মেঝেতে কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই চারপাশে দেয়াল নেমে এলো।

এবার বনহুর বুঝতে পারলো জাহাজের কোনো গোপন কক্ষ বা ক্যাবিনে বসে কেউ সুইচ টিপে রহস্যজনকভাবে কার্যোদ্ধার করে চলেছে।

নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি জাহাজের সব লোককে হত্যা করেছে কৌশলে। এমন কি ক্যাপ্টেনকেও সে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে খালাসিদের সবাইকে। কে সেই ব্যক্তি যে জাহাজের সবাইকে হত্যা করে সম্পূর্ণ জাহাজখানাকে নিজ আয়ত্তে এনে নিয়েছে? হয়তো বা জাহাজেরই কোনো কর্মকর্তা কিংবা দলের কোনো লোক।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলো না বনহুর, তার দেহখানা শিকলে বাঁধা পড়লো। একটুও নড়বার ক্ষমতা রইলো না আর।

এবার বনহুর কাহিল হয়ে পড়লো। একটা বেড়াজাল তাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে ধরেছে। এ বন্ধন থেকে সে মুক্ত হতে পারলো না।

হুর আবদ্ধ হবার পর তাকে সহ মেঝেটা নেমে এলো নিচে কিন্তু এ জায়গাটা সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চারপাশে নানা ধরনের কলকজা আর মেশিন।

লোকটার দেহে স্বাভাবিক পোশাক পরিচ্ছেদ নয়, কেমন যেন ভীষণ অদ্ভুত ধরনের পোশাক। লোকটা কি কলকজ্বা দিয়ে তৈরি?

বনহুর নিজ দেহের শিকল খুলে ফেলতে চেষ্টা করলো কিন্তু একটুও শিথিল করতে পারলো না বন্ধনটা। ভাবছে বনহুর, এখন এখন তাকে গলা টিপে হত্যা করবে ঐ লোকটা, কারণ অদ্ভুত লোকটা দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে।

বনহুর স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো, এবার আর কোনো উপায়ে উদ্ধার নেই। লোকটা হিংস্র জন্তুর মত এগিয়ে আসছে। দ্রুত গতিতে সরে দাঁড়ালো বনহুর কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার লোহার বর্ম পরিহিত লোকটা বনহুর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই জায়গাটা ডিংগিয়ে সোজা চলে গেলো এবং সম্মুখস্থ একটা থামকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেললো দু'হাত দিয়ে।

হতবাক বনহুর তাকিয়ে আছে।

লোকটা ততক্ষণে সোজা সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে যা পাচ্ছে তাই মোচড় দিয়ে দিয়ে ভেঙে দুমড়ে ফেলছে। কি ভয়ঙ্কর শক্তি ঐ লোকটার গায়ে। কিন্তু বড় আশ্চর্য, লোকটাকে কেমন যেন বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত দেহটা ওর যেন লোহা দিয়ে তৈরি। যা তার সম্মুখে পড়ছে ভেঙে চুরমার করে ফেলছে।

বনহুর শৃঙখলাবদ্ধ অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। সেই ভীষণ চেহারার লোকটা আবার ফিরে দাঁড়ালো এবং সোজাসুজি বনহুরের দিকে এগুতে লাগলো।

এবার বনহুর বুঝতে পারলো, যে লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসছে সে আসল মানুষ নয়, নকল মানুষ—যন্ত্র চালিত কোনো কল...যা কোনো জীবন্ত মানুষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বনহুর সরে দাঁড়াতে গিয়ে এবার পড়ে গেলো মেঝেতে।

ততক্ষণে যন্ত্রচালিত দানবটা তার দেহের উপর দিয়ে চলে গেলো। ভাগ্যিস্ তার দেহে যন্ত্রচালিত দানবটার পা পড়েনি, নইলে পিষে থেতলে যেতো বনহুরের শক্তিশালী সবল দেহটা।

যন্ত্রচালিত দানবটা সোজা মেশিনের দিকে চলে গেলো এবং ভীষণ শব্দে ভেঙে ফেললো বয়লার জাতীয় একটা স্তম্ভ। অমনি এক ভয়ঙ্কর কানফাটা শব্দ হলো। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো বনহুর।

যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো তখন বনহুর দেখলো একরাশ চূর্ণবিচূর্ণ বস্তুর মধ্যে পড়ে আছে সে। তার দেহে তখনও শিকল জড়ানো রয়েছে।

বনহুরের দেহের উপরেও পড়ে আছে একটা মস্ত বড় তক্তা।

পায়ের কাছাকাছি একটা অদ্ভুত মেশিন পড়ে আছে।

বনহুর শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সোজা হয়ে উঠে বসলো। যদিও তার বড় কষ্ট হচ্ছিলো তবু সোজা হয়ে বসে নিজ দেহ থেকে শিকল খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

বেশ সময় কেটে গেলো তার।

সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। বনহুর খুব কষ্টেসৃষ্টে শিকল খুলে ফেললো। উঠে দাঁড়ালো সে আস্তে আস্তে। জাহাজখানা তেমনি ভাসমান রয়েছে। শুধু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেই কক্ষটি।

চারদিকে মেশিনাদি ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে। খন্ড খন্ড তক্তার টুকরা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। বনহুর তক্তা সরিয়ে ফেলতে লাগলো।

হঠাৎ ওদিকের তক্তা সরিয়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়লো একটি ঝুলন্ত সিঁড়ি।

বনহুর অবাক হয়ে গেলো ঝুলন্ত সিড়িখানা, খোলের ভিতর দিয়ে সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। বনহুর বিলম্ব না করে ঝুলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো।

জাহাজের তলদেশে এমন কোনো সুড়ঙ্গ পথ এবং সিঁড়ি থাকতে পারে ভাবতে পারেনি বনহুর। সোজা সে নিচে নেমে গেলো। একি বিস্ময়, বনহুর দেখলো জাহাজ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে একটি ক্যাবিন। সিঁড়িখানা নিচে সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনের মধ্যে এসে থেমে গেছে।

বনহুর ক্যাবিনের মেঝেতে নেমে দাঁড়াতেই প্রথমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো একপাশে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চেয়ারসহ উবু হয়ে পড়ে আছে একটি লোক।

লোকটা জীবিত না মৃত বোঝা গেলো না।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, ভালভাবে দেখতে লাগলো সে সবকিছু। জাহাজের তলদেশে সমুদ্র গহ্বরে

ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে ক্যাবিনটা। শুধু রয়েছে একটি লোহার শিকলের মজবুত সিঁড়ি।

বনহুর লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

চীৎ করে ফেললো বনহুর লোকটার দেহটাকে একটানে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো, লোকটার কণ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গেছে সম্মুখস্থ ধ্বংসস্তূপের একটি সূতীক্ষ্ণ শলাকা অথবা কাঁচের টুকরা।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো যে চেয়ারটায় লোকটা বসেছিলো তার সামনেই রয়েছে একটা বিরাট টেলিভিশন সেট এবং সেটা এখন ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে, তারই একটি কাঁচের টুকরা প্রবেশ করেছে লোকটার কণ্ঠদেশে। সেই কারণেই যে তার মৃত্যু ঘটেছে নিশ্চিন্ত।

বনহুর বুঝতে পারলো, এই লোকটাই জাহাজের তলদেশে ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসে জাহাজটিকে চালাচ্ছিলো এবং সবকিছু সে এখানে বসেই করছিলো তার সম্মুখস্থ মেশিনের সাহায্যে। সামনে নানা ধরনের মেশিনাদি এবং সুইচ ছিলো, যার দ্বারা সে অনায়াসে সব কাজ করে যাচ্ছিলো।

সম্মুখস্থ টেলিভিশনটায় সে দেখতে পাচ্ছিলো সবকিছু। যে টেলিভিশন তার সর্বকাজে সহায়ক ছিলো—সেই টেলিভিশনই তার মৃত্যুর কারণ হলো। সেই টেলিভিশনের মোটা কাঁচের টুকরা তার জীবন নাশ করেছে।

বনহুর একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে হাসলো। দীর্ঘদিন সে এমন করে হাসেনি। হাসি থামিয়ে আপন মনেই বলে উঠলো বনহুর—যেমন কাজ তেমনি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে! কতকগুলো মৃত ব্যক্তির মুখ ভাসতে লাগলো বনহুরের চোখের সামনে। যে ব্যক্তিগুলোকে এই লোকটা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। হত্যা করেছিলো সে কৌশলে সিগারেটে বিষ প্রয়োগ করে। যে যেখানে সিগারেট পান করেছে সে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, এমন কি যে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অথচ তার আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে তার অলক্ষ্যে।

বনহুর যত ভাবছে তত যেন আরও বিস্ময় বাড়ছে। এতোগুলো লোককে সে একই সময় হত্যা করেছে। কেমন সূক্ষ্মভাবে সে কাজ করেছে। বিষাক্ত সিগারেটগুলো সে ঠিক একই সময়ে সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। একই সময় যদি তারা সিগারেট পান না করতো তাহলে তারা এমনভাবে মৃত্যুবরণ করতো না।

এই লোকটার এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিলো জাহাজের সবাইকে সে হত্যা করে নিজে একাই এ জাহাজের অধিকারী হবে এবং শেষ অবধি হয়েও ছিলো তাই।

জাহাজখানা অবশ্য সাধারণ জাহাজ ছিলো না। কারণ জাহাজের ডেকে পা রেখেই বনহুর বুঝতে পেরেছিলো এ জাহাজ বড় রহস্যময় এবং বিস্ময়কর।

অবশ্য বনহুর এখনও এ জাহাজখানার সম্পূর্ণ রহস্য ভেদ করতে পারেনি, তবু যতটুকু সে জানতে পারলো তাই সে বেশ অনুধাবন করতে সক্ষম হলো যে, এটা একটা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর জাহাজ।

চীৎ হয়ে পড়ে থাকা মৃত লোকটার দিকে ভাল করে তাকালো। লোকটার বয়স চল্লিশের অধিক হবে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অদ্ভুত ধরনের চশমা, মৃত্যুর পরও চশমাটা এখনও তার চোখে লেগে আছে শক্ত হয়ে। দেহ বলিষ্ঠ কিন্তু একটু বাঁকা ধরনের বলে মনে হলো। দেহে কালো চামড়ার তৈরি পোশাক। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাটা।

বনহুর উবু হয়ে লোকটার চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললো। এবার স্পষ্ট দেখলো লোকটার চোখ দুটোর পাতা এখনও মুদে যায়নি। শয়তানের চোখের মত দুটো চোখ। মুখখানা যেন কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো বনহুরের।

কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবতেই মনে পড়লো এই লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে। যে লৌহ মানুষটা জাহাজে তাকে হত্যা করবার জন্য দু'হাত প্রসারিত করে এগুচ্ছিলো ঠিক তার চেহারার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। তবে কি এই লোকটা তার নিজের চেহারার অনুকরণে লৌহ মানুষটাকে তৈরি করেছিলো?

কিন্তু এর জবাব কে দেবে?

বনহুর এলোমেলোভাবে নানা কিছু ভাবছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকে। একরাশ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে আছে একটি দেহ—মৃত না জীবিত বোঝা যাচ্ছে না।

দ্রুত এগিয়ে গেলো বনহুর। সেইদিকে নিকটবর্তী হতেই বিস্ময়ে হতভম্ব হলো। ফুল্লরার সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে। তার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা।

বনহুর তাড়াতাড়ি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ফেললো এবং বের করে আনলো ফুল্লরার জ্ঞানহীন দেহটা। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো ফুল্লারার মৃত্যু হয়নি, সে এখনও জীবিত আছে।

দেহের নানা স্থানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে।

বনহুর বুঝতে পারলো, ঝুলন্ত ক্যাবিনটার কোনো এক অংশে ফুল্লরাকে আটক করে রাখা হয়েছিলো এবং সেই কারণেই ফুল্লরাকে জাহাজের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বনহুর ফুল্লরার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো জাহাজের উপরের ডেকে। পাশেই একটি পরিচ্ছন্ন ক্যাবিন, সেই ক্যাবিনে ফুল্লরাকে শুইয়ে দিলো এবং তাড়াতাড়ি তার সংজ্ঞা ফিরানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

ফুল্লরাকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাবে, এ ভরসা ছিলো না বনহুরের। একটা আনন্দ তার মনকে উচ্ছল করে তুললো। ঝুকে পড়ে দেখতে লাগলো বনহুর ফুল্লরাকে।

কয়েক ঘন্টা পর সংজ্ঞা ফিরে এলো ফুল্লরার।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো ফুল্লরা।

বনহুর খুশিভরা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—ফুল্লরা! ফুল্লরা......

আপনি! সর্দার আপনি!

হাঁ ফুল্লরা, আমি... এখন কেমন বোধ করছো?

আমি এখন কোথায়?

জাহাজেই আছো কিন্তু সব বিপদ কেটে গেছে।

ঐ—ঐ নরশয়তান, যে আমাকে জোর করে ধরে গিয়ে আটকে রেখেছিলো সে কোথায়?

বনহুর ফুল্লরার কপালে হাত বুলিয়ে বললো সে নিজের মৃত্যুপথ নিজেই বেছে নিয়েছে, তার মৃত্যু ঘটেছে ফুল্লরা। তার মৃত্যু ঘটেছে।

সত্যি!

হাঁ—হাঁ ফুল্লরা।

এই ব্যথাকাতর মুহূর্তেও ফুল্লরার মুখে হাসি ফুটলো। একটা তৃপ্তিময় হাসি।

বনহুর বললো—ফুল্লরা, এখন আমরা শুধুমাত্র দু'জন এই জাহাজের সর্বময় কর্তা, কাজেই আমি নিশ্চিন্ত। এবার ঘুমাও। কিছুক্ষণ ঘুমালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

বনহুরের কথাগুলো বড় মধুর লাগলো ফুল্লরার কানে। আস্তে চোখের পাতা দুটো মুদে এলো তার। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ফুল্লরা।

ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো বনহুর।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, এ জাহাজখানা তো আর কোনোদিন ভাসবে না। সমস্ত কলকব্জা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কাজেই জাহাজখানা সম্পূর্ণ অকেজো এখন। জাহাজে কোনো খাদ্যদ্রব্য নেই, এমনকি পানিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। যদি এ পথে কোনো জাহাজ না আসে তাহলে আর কোনো দিন ফিরে যেতে পারবে না তারা জনসমাজে। নানা ধরনের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে বনহুর। নিজের জন্য তার তেমন কোনো ভাবনা হচ্ছে না, ভাবনা তার ফুল্লরাকে নিয়ে।

এক সময় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো ফুল্লরা।

এতো বিপদেও তার মুখে হাসি ফুটেছে। একসময় ফুল্লরা বলে বসলো বনহুরকে—আমি সেই নরপশুটাকে দেখতে চাই।

আমাকে সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনে নিয়ে চলুন।

ফুল্লরা, আপনি নয় তুমি বলবে, যেমন প্রথম বলতে।

আচ্ছা, তাই বলবো। নিয়ে চলো আমাকে এবার।

চলো।

বনহুর আর ফুল্লরা এগিয়ে চললো ইঞ্জিন ক্যাবিনের দিকে। ঐ ক্যাবিনের মেঝেতেই ছিলো ঝুলন্ত সিঁড়ির সুড়ঙ্গমুখ।

ফুল্লরা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে।

সে জানে, তাকেও এই ইঞ্জিনকক্ষে নিয়ে আসা হয়েছিলো এবং একটি সুইচ টিপতেই মেঝের কিছু অংশ তাকে সহ নেমে গিয়েছিলো নিচে।

জমকালো পোশাকপরা একটা লোককে সে দেখতে পেয়েছিলো সেখানে। লোকটা বসেছিলো একরাশ মেশিন আর যন্ত্রপাতির মধ্যে। এক একটা বোতাম আর সুইচ টিপছিলো, অমনি নানা ধরনের আলো জ্বলছিলো তার সামনে।

বনহুর বললো—কি ভাবছো ফুল্লরা?

ফুল্লরার সম্বিৎ যেন ফিরে এলো, বললো—কিছু না। তবে ভয় হচ্ছে যদি আবার কোনো বিপদ আসে।

আর আমাদের কোনো ভয় নেই। এ জাহাজে শুধু তুমি আর আমি...

সেই লোকটা? যে আমাকে তোমার অজ্ঞাতে জোর করে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছিলো জাহাজটার তলদেশে সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনে।

আমি ঐ ক্যাবিনেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি ফুল্লরা। সেখানে গেলেই তুমি সব দেখতে পাবে।

বনহুর ফুল্লরার সম্মুখে একটি হ্যান্ডেলে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একপাশে একটি স্পষ্ট সুড়ঙ্গমুখের মত দরজা বেরিয়ে এলো। ঐ মুহূর্তে আরও একটি জিনিসের উপরে তার নজর পড়লো, সে হলো ঐ লৌহ মানুষটির খন্ডবিখন্ড দেহটা, যার বিকট চেহারাখানা এখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ফুল্লরা কিছু প্রশ্ন করার পূর্বেই বলে উঠলো বনহুর—ঐ যে একটা বিকট চেহারার মনুষ্য আকৃতির খন্ড বিখন্ড ভগ্নাংশ দেখছো, ওটা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো...

বাপুজী!

হাঁ ফুল্লরা, কিন্তু পারেনি, কারণ খোদা যার সহায় কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ঐ যে কথায় বলে রাখে আল্লা মারে কে! ওটা ছিলো মেশিন দ্বারা পরিচালিত একটি লৌহদানব। ঐ লৌহদানব দ্বারা একজন কুচক্রী তার ইচ্ছামত এই জাহাজে বিচরণ করে ফিরতো।

আমি এবার বুঝতে পেরেছি, সেই ব্যক্তি যে আমাকে আটক করেছিলো এবং আমাকে বিয়ে করবে বলে নানা ধরনের কুৎসিত কথা বলতো।

সে আর জীবিত নেই ফুল্লরা।

তাকে তুমি হত্যা করেছো?

না, ঠিক আমি করিনি, করেছে ঐ লোহদানব যাকে দিয়ে সে এ জাহাজে কুকর্ম চালাতো।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

সব বুঝতে পারবে ফুল্লরা, আগে চলো তোমাকে নিয়ে ঝুলন্ত ক্যাবিনটা ঘুরে আসি......

কিন্তু আমি যে ঐ ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারি না।

আমি তোমাকে নামিয়ে নেবো ফুল্লরা।

বনহুর ফুল্লরার হাত ধরে অতি কৌশলে সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনের মেঝেতে নেমে এনে এসে দাঁড়ালো। রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে ফুল্লরা। একে তার কচি বয়স, তারপর নানারকম ভয় তার মনকে অস্থির করে তুলছিলো। কারণ ঐ ক্যাবিনে তাকে কঠিন যন্ত্রণাদায়কভাবে আটকে রাখা হয়েছিলো। বনহুর যখন ফুল্লরা ফুল্লরা করে চিৎকার করে ডাকছিলো তখন ফুল্লরা ঝুলন্ত ক্যাবিনে কঠিন বন্ধনযুক্ত অবস্থায় থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলো। কারণ একমন একটা মেশিন ঐ ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসানো ছিলো যে মেশিন সাউন্ডবক্সের কাজ করতো। জাহাজে কে কি করছে সব সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনের টেলিভিশনে ধরা পড়তো এবং সাউন্ডবক্সে শব্দ ভেসে আসতো। নরপশু শয়তান লোকটা ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসে জাহাজটাকে চালনা করতো।

ফুল্লরা বন্দী অবস্থায় শুনতে পেতো জাহাজের সব শব্দ গুলো, এমনকি বনহুর যখন ফুল্লরা ফুল্লরা করে ডাকছিলো তখন সে ঐ ঝুলন্ত ক্যাবিনের মধ্য হতেই শুনতে পাচ্ছিলো বনহুরের গলার আওয়াজ কিন্তু সে নিরুপায় ছিলো, কোনো উপায় ছিলো না যে সে জবাব দেয়। দু'হাতে মুখ ঢেকে শুধু কেঁদেছে ফুল্লরা। প্রাণভয়ে কেঁদেছে। নরশয়তানটা তাকে কৌশলে আটক করে নিয়ে এসেছিলো এবং তাকে নিজের বশীভূত করে নিতে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি। ফুল্লরার দেহ স্পর্শ করতে গেলেই ফুল্লরা আত্মহত্যা করবে বলেছে। তাই নরপশুটি তাকে স্পর্শ করার সাহসী হয়নি, ভেবেছিলো মেয়েটি তো তার হাতের মুঠায়ই আছে, যে কোনো মুহূর্তে তাকে সে আয়ত্তে এনে দিতে পারবে।

কিন্তু নরপশুটা সে সুযোগ পায়নি।

বনহুর ফুল্লরাকে সাহায্য করলো ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে। অদ্ভুত এ সিঁড়ি, চারপাশে কাঁচবেষ্টিত দেয়াল তবে ঠিক কাঁচ কিনা বুঝা যাচ্ছে না, অন্য কোন বস্তুও হতে পারে। ফুল্লরা আর বনহুর যখন ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলো তখন তাদের চারপাশে অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ এবং নানা ধরনের বিস্ময়কর জীব চোখে পড়ছিলো। আরও একটা জিনিস বনহুর এবার লক্ষ্য করলো, তা হচ্ছে একটি ডুবু দ্বীপ যে দ্বীপটার সঙ্গে জাহাজখানা আটকে গেছে।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো ডুবু দ্বীপটার গায়ে অসংখ্য ফোকড় রয়েছে। ফুল্লরা বললো—ডুবু দ্বীপের গায়ে ওগুলো কি দেখা যাচ্ছে?

ওগুলো কি আমি নিজেও তা নিয়ে ভাবছি। ওগুলো অসংখ্য ছিদ্র বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে ছিদ্র নয়, কোনো জলজীবের বাসস্থান।

বনহুর আর ফুল্লরা সেখানে আর বিলম্ব না করে নিচে নেমে গেলো সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনটার মধ্যে।

ফুল্লরার দৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে পড়লো উবু হয়ে পড়ে থাকা নরপশুটার উপরে; দেখেই সে আনন্দধ্বনি করে উঠলো—বাপজী, ও মরে গেছে?

ফুল্লরার আনন্দভরা কণ্ঠস্বর বনহুরকে খুশি করলো। চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হলো তার। ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো—ফুল্লরা ওর নিজের মৃত্যু নিজেই গ্রহণ করেছে......তার মানে এই নরশয়তানটাই হলো এ জাহাজের নৃশংস হত্যাকান্ডের অধিনায়ক। ফুল্লরা, যে মৃতদেহগুলো আমরা এ জাহাজে এসে দেখতে পেয়েছিলে, তাদের মৃত্যুর কারণ এই ব্যক্তি...

কথার ফাঁকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হঠাৎ নজর চলে গেলো বনহুরের। উবু হয়ে তুলে নিলো একখানা ডায়রী, ডায়রীখানার মাঝে খানিকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। বনহুর ডায়রীখানা উল্টেপাল্টে বললো—এ ডায়রী থেকে আমরা

অনেক কিছু জানতে পারবো। এ ডায়রীর মধ্যেই আছে জাহাজখানার গভীর রহস্য, বুঝলে ফুল্লরা...তবে ডায়রীখানার কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটু অসুবিধা হতে পারে।

ফুল্লরার তখন দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। সে হতভম্ব হয়ে নিহত লোকটাকে দেখছে। পিছন থেকে কোনো ক্ষত দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে লোকটা উবু হয়ে শুয়ে আছে।

প্রথমে লোকটা চীৎ অবস্থায় পড়েছিলো, বনহুর তাকে উবু করে পেছন অংশ বা পিঠের দিকটা দেখেছিলো, তাই মৃত দেহটা এখন উবু হয়েছিলো।

ফুল্লরা দেখলো মৃত লোকটার সম্মুখস্থ মেশিনপত্র সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একরাশ ভাঙা যন্ত্রপাতি এবং কাঁচের মধ্যে পড়ে আছে নরশয়তানটা। ফুল্লরা বললো—এভাবে সব ধ্বংস না হলে ওর মৃত্যু ঘটতো না।

হাঁ, ঠিক বলেছো ফুল্লরা, লোকটা খুব চালাক এবং শয়তান। এ ঝুলন্ত ক্যাবিনটার মধ্যে বসে সে সব কাজ করতো। এত বড় জাহাজখানা সে চালনা করছিলো এখানে বসে। ওর সামনে ঐ যে বিশাল আকার ভগ্ন টেলিভিশন সেটা দেখছো, ওর পর্দায় সে সবকিছু দেখতে পেতো এবং সেইভাবে কাজ করতো। জানো ফুল্লরা, আমরা যখন সেই ক্ষুদ্র ভেলায় চেপে সমুদ্রগর্ভে ভেসে ভেসে এগুচ্ছিলাম তখন সে এখানে বসে ঐ টেলিভিশন পর্দায় আমাদের দেখতে পেয়েছিলো আর সেজন্য সে কৌশলে জাহাজখানাকে মন্থর গতিতে আমাদের ভেলার পাশে এনে হাজির করেছিলো।

কি আশ্চর্য!

হাঁ, বড় আশ্চর্য ব্যাপার। সবই রহস্যময় ফুল্লরা, চলো আমরা এবার উপরে ক্যাবিনে গিয়ে বসি এবং এই ডায়রীখানা মেলে দেখি কি লেখা আছে এটার মধ্যে।

তাই চলো, আমরা উপরে যাই কিন্তু....

বলো কিন্তু কি?

ঐ ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আমার বড় ভয় হয়।

কোনো ভয় নেই ফুল্লরা, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। চলো।

আর একটু দেখবো।

বেশ তো দেখো।

ফুল্লরা অবাক চোখে দেখতে লাগলো।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার, এমন ঝুলন্ত ক্যাবিন যা গভীর পানির তলায় ভাসমান রয়েছে অথচ সেই ক্যাবিনে বসে একটি বিরাট জাহাজকে কোনো

এক রহস্যময় শক্তির দ্বারা চালনা করছে। ফুল্লরা কেন, বনহুর নিজেও কম বিস্মিত হয়নি।

এক সময় উঠে এলো বনহুর আর ফুল্লরা জাহাজের ডেকে। দু'জন দু'খানা চেয়ারে বসলো পাশাপাশি।

বনহুর ডায়রীখানা মেলে দেখতে লাগলো।

ফুল্লরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রহর গুণছে, না জানি কি রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ খাতাটার মধ্যে।

বনহুর পড়তে শুরু করলো। ডায়রীখানা ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলো তাই বনহুরের পড়তে কোনো কষ্ট হলো না।

"আমার নাম কোকোকং মিস্কো, জন্ম আমার কোন্ শহরে জানি না, তবে জ্ঞান হবার পর নিজকে আবিষ্কার করলাম ফিলেপাইগু-এর কোন এক অজ্ঞাত পল্লীতে। এক কৃষকের বাড়িতে গরু ছাগল আর দুম্বা চরাতাম। মনিব গৃহিণীর তিরস্কার আর মনিবের চাবুকের আঘাতে আমার দেহের চামড়া গন্ডারের চামড়ার মত শক্ত হয়ে উঠেছিলো। তাই ভয় পেতাম না মনিবের চাবুককে। মাঝে মাঝেই ছাগল কিংবা দুম্বার বাচ্চা জবাই করে আগুনে পুড়িয়ে খেতাম পাহাড়ে কোনো এক গুহায়। খামারে ফিরে মনিবকে বলতাম বাঘে খেয়েছে কিংবা নদীতে পড়ে গিয়ে ভেসে গেছে স্রোতের টানে।

মনিব প্রথম প্রথম বিশ্বাস করলেও পরে তার মনে সন্দেহ এসেছিলো, তাই একদিন মনিব গোপনে আমার কান্ডকারখানা দেখে ফেললো নিজের চোখে। সেদিন আমাকে বেদম প্রহার করলো মনিব শংকর মাছের লেজের চাবুক দিয়ে।

গন্ডারের চামড়ার মত শক্ত চামড়া হলেও আমি মানুষ তো, তাই শংকর মাছের লেজের আঘাতে আমার পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। আমি কাঁদলাম, ব্যথায় মাটিতে গড়াগড়ি গেলাম। তারপর গভীর রাতে সট্‌কে পড়লাম সেখান থেকে।

তারপর শুরু হলো আমার নতুন জীবন।

পথে পথে ঘুরে বেড়ানো আর ডাষ্টবিন থেকে আবর্জনা হাতড়ে খাবার সংগ্রহ করে খাওয়া। কোনোদিন সে জীবনের কথা ভুলবো না। সেদিন ভাবতেই পারিনি—একদিন আমি কোটি কোটি টাকার মালিক হবো।

হাঃ হাঃ হাঃ! আজ আমি মিঃ কোকোকং মিস্কো। একটা নয়, পাঁচটা জাহাজ আমার সমুদ্রের বুকে বিচরণ করে ফিরছে। আমি পাঁচটা জাহাজের মালিক।

এখন আমি পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে চাই না, কারণ আমি ভাবতেই পারি না আমি সেই কোকোকং যে একদিন ডাষ্টবিনের আবর্জনা হাতড়াতো ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সেই জীবন আমি মুছে ফেলেছি। কোনোদিন আর আমি ঐ জীবন ফিরে যেতে চাই না।

আমার এক নাম্বার জাহাজ 'মিস্কো' আমার প্রিয় জাহাজ। আমার সবগুলো জাহাজের মধ্যে এ জাহাজখানাকে আমি বেশি ভালবাসি, কারণ এই মিস্কোই আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছে।

অবশ্য মিস্কো প্রথমে আমার ছিলো না, এর নামও মিস্কো ছিলো না।

এই জাহাজের নাম ছিলো 'নান্‌হা' মানে উড়োপাখি। এ জাহাজের মালিক ছিলো এক কাফ্রি যাদুকর, নাম পাঁর আলকা মস্কো। অত্যন্ত চতুর আলকা মস্কোর সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায়। কেমন করে আমার পরিচয় হলো তা বিস্ময়কর না হলেও একটু অদ্ভুত ধরনের।

আমি যখন বড় হলাম মানে বয়স যখন বিশ ছাড়িয়ে গেলো তখন আর ডাষ্টবিন হাতড়াতাম না, কুলিগিরি করতাম। কখনও কখনও পকেট মারতাম কৌশলে। হয়তো কোনোদিন আংগুলে শুধু ব্যাগ উঠে আসতো, আবার কোনোদিন মোটা অংক জুটে যেতো।

কয়েকদিন মজা করে খাওয়া দাওয়া চলতো, আবার ব্যাগ শূন্য হলে দু আংগুলের কাজ শুরু করতাম। এমনি করে কেটে গেলো দীর্ঘ কয়েক বছর।

হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একদিন নানহায় খালাসি হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলাম। বয়স তখন আমার অনেক বেশি হয়ে গেছে, ত্রিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে এগিয়ে চলেছি।

দু'আংগুলের কাজে বেশ পাকা হয়ে গেছি এখন।

নানহায় কাজ পেলাম।

খালাসির কাজ।

কিন্তু মন আমার ভরলো না।

আমি যাত্রীদের পকেট মারতাম, তবে খালি ব্যাগ আর আংগুলে উঠতো না। কোনো যাত্রীর পকেট কেমন গরম আছে তা আমার জানা হয়ে যেতো যাত্রীর মুখ দেখেই। আগের মত ছ্যাঁচড়া পকেটমার আমি আর নেই। একদিন এমন এক ব্যক্তির পকেট মারলাম যা আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলো।

আলকা মস্তো টের পেয়ে গেলো। তার যাদুবিদ্যার চেয়ে আমার দু'আংগুলের যাদুবিদ্যা কম নয়। আমাকে সে খালাসির পদ থেকে বন্ধুর পদে বহাল করে নিলো এবং নিজের পাশে আশ্রয় দিলো।

আমি বন্ধু হয়ে আলকার মনে সূঁচের মত প্রবেশ করলাম। আমার মনের কথা সে জানে না, জানলে সে আমাকে জাহাজে পা রাখতে দিতো না।

আমি ক'দিনেই জেনে নিলাম আলকার মনের কথা। সে আমাকে বিশ্বাস করে সঙ্গী করে নিলো এবং তার গোপন সবকিছু দেখালো। জাহাজখানার মধ্যে এত রহস্য লুকিয়ে ছিলো তা জানতাম না। একে একে সব জেনে নিলাম।

একদিন আমার মনে উদয় হলো, আলকা কোটি কোটি টাকার মালিক, ইচ্ছা করলে আমিও হতে পারি। জাহাজের যাত্রী যারা প্রচুর অর্থ বা স্বর্ণ নিয়ে আরোহণ করতেন তারা আর জাহাজ থেকে অবতরণ করতেন না, কারণ তাঁরা গন্তব্য স্থানে পৌছবার আগেই রাত্রে উধাও হয়ে যেতেন জাহাজ থেকে। কোথায় গেলেন বা যেতেন কেউ জানতো না। শুধু জানতো আলকা মিস্কো আর আর সহকারীরা।

তার এই রহস্য আমি নিজেও জেনে নিলাম আলকার বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে।

জাহাজ এ বন্দর থেকে সে বন্দরে নোঙ্গর করতো তারপর পুনরায় হতো যাত্রা শুরু।

অল্পদিনেই আমি আলকা মিস্কোর প্রধান সহকারী হয়ে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলাম। আলকার অর্থ আর ধন সম্পদ দেখে মাঝে মাঝে আমার মন বিগড়ে যেতো। কেন, আমি নিজে কি আলকা মিস্কোর মত হতে পারি না? এ জাহাজ কি আমার হতে পারে না?

অতি সাবধানে মনের বাসনা চেপে কাজ করে চললাম। দীর্ঘ সময়ে আলকার সবকিছু যাদুর কারসাজি আমার জানা হয়ে গেলো।

এই জাহাজে এতো রহস্য কে জানতো?

রহস্যর বেড়াজাল গুটিয়ে নিজের মুঠায় নেবার চেষ্টা চালালাম। সমস্ত দিন ভাবতাম কেমন করে এই জাহাজখানা আমার নিজের করে নিতে পারি।

একদিন গভীর রাতে আলকা মিস্কো যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলো তখন আমি তার নাকে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে তাকে নিস্তেজ করে নিলাম। তারপর সকলের অজ্ঞাতে সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করলাম। যেমন করে আলকা মিস্কো তার জাহাজের বিশিষ্ট যাত্রিগণকে সকলের অগোচরে সরিয়ে ফেলতো, তেমনি করে সরিয়ে ফেললাম। কেউ জানলো না আলকা মিস্কো কোথায় গেলো।

পরদিন জাহাজে ভীষণ তোলপাড় শুরু হলো।

জাহাজের মালিক জাহাজ থেকে উধাও হয়েছে।

গেলো কোথায় সে, এনিয়ে জোর তদন্ত শুরু হলো। আলকা মিস্কোর সহকর্মীদের মধে আমিই হলাম প্রধান। কাজেই আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে হলো এ ব্যাপারে এবং আমিই বেশি ব্যস্ততা দেখাতে লাগলাম।

অনেক সন্ধান চালিয়েও পাওয়া গেলো না আলকা মিস্কোকে, আর পাওয়া যাবেই বা কি করে, তাকে তো সমুদ্র গ্রাস করেছে।

এরপর কেটে গেলো কয়েকটা মাস।

জাহাজের মালিকের অবর্তমানে আমিই হলাম মালিক। তবে যারা পূর্ব হতেই আলকা মিস্কোর সঙ্গে ছিলো তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো। তারা আমাকে কখনও কখনও হুমকি দিতে লাগলো এ জাহাজ থেকে নেমে যাবার জন্য।

আমি বুঝতে পারলাম পুরোন যারা তাদের সরিয়ে ফেলতে হবে। ওদের সরাতে না পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। কারণ ওরা আলকা মিস্কোর নিরুদ্দেশের ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। ভেবেছিলাম আলকা মিস্কোকে কোনোক্রমে সরিয়ে ফেললেই আমি জয়যুক্ত হবো এবং জাহাজের যথাসর্বস্বের মালিক হবো। আসলে হলামও তাই কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালো জাহাজের পুরোন কর্মিগণ। আমাকে তারা বাঁকা চোখে দেখতে লাগলো।

আমি যখন আলকা মিস্কোর সঙ্গে ছিলাম তখন সে আমাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলো যা সে তার বিশ্বাসী অনুচরদেরও দেখায়নি বা জানতে দেয়নি।

আলকা মিস্কো জাহাজের তলদেশে তার ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসে কাজ করতো, এমন কি ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসে সে জাহাজ চালনা করতে পারতো। সেই ঝুলন্ত ক্যাবিনে আছে ক্যামেরা, টেলিভিশন এমন কি সমুদ্র গর্ভের গভীর জলরাশি তলদেশ দর্শন করবার মত শক্তিশালী মেশিন।

আলকা মিস্কোর সঙ্গে আমি মাঝে মধ্যে নেমে আসতাম এই ঝুলন্ত ক্যাবিনে, আলকা মিস্কোর সঙ্গে বসে কাজ করতাম। কাউকে বিশ্বাস না করলেও আমাকে সে বিশ্বাস করতো অন্তর দিয়ে কিন্তু আমি তার সে বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং একদিন সফলকাম হলাম।

ঝূলন্ত ক্যাবিনে বসেই আমি গোটা জাহাজখানাকে আয়ত্তে এনে নিলাম। এখন আমার একমাত্র চিন্তা আলকা মিস্কোর পুরোন সঙ্গিগণকে খতম করা।

গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম কেমন করে কাজ হাসিল করবো। সব সময় ঐ একই চিন্তা আমাকে পাগল করে তুললো।

আলকা মিস্কোকে যেভাবে সরিয়েছি সেভাবে সবাইকে সরানো সম্ভব নয়, তাই অন্য উপায় খুঁজছি। একসঙ্গে যেন সবাইকে পরপারে পাঠাতে পারি।

রিপুন বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করেছে।

এক উপায় মাথায় এলো।

নতুন ধরনের সিগারেট কিনে নিলাম—বেশ কিছু প্যাকেট। তারপর সিগারেটে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করিয়ে নিলাম। খেতে দিলাম সবাইকে। অবশ্য যখন জাহাজ 'নানহা' সমুদ্রে মাঝামাঝি পথে চলছিলো ঠিক সেই সময় পরিবেশন করলাম নতুন সিগারেটের প্যাকেট। মনের আনন্দে সিগারেট গ্রহণ করলো সবাই এবং পরম তৃপ্তির সঙ্গে পান করলো...... তারপর সবাই নীরব।

আমি ঝুলন্ত ক্যাবিনে বসে টেলিভিশন ক্যামেরায় সব দেখলাম। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলাম, সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার দেওয়া সিগারেট তাদের সবাইকে একই সঙ্গে ঠান্ডা করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

খুশিতে যখন আমি উচ্ছ্বসিত তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেলো দূরে অনেক দূরে একটি ভাসমান ভেলায় দু'জন জীবিত মানুষ।

সীমাহীন সমুদ্রের জলরাশির বুকে জীবিত মানুষ এলো কি করে? কিন্তু কে এর জবাব দেবে? আমি তাড়াতাড়ি করে গোটা জাহাজখানা পরিদর্শন করে নিলাম। খাবার টেবিলে খাবার পড়ে রয়েছে, কারো মুখে খাবার যায়নি।

খালাসি কাজের ফাঁকে নতুন সিগারেটে টান দিয়েছিলো প্রাণ ভরে ধূম্রপান করবে কিন্তু শেষবারের মত তারা ধূমপান করে প্রাণ ভরাতে পারেনি।

আংগুলের ফাঁকে সিগারেট রয়েছে, সবাই যেমন ছিলো তেমনি রয়েছে।

এমন কি ক্যাপ্টেন মাসিহলোরীও সিগারেট পান থেকে অব্যাহতি পায়নি। সেও ধূমপান করেছে পরম তৃপ্তির সঙ্গে। ক্যাপ্টেন মাসিহলোরী বেচারা আমার বন্ধুলোক ছিলো। তবু তাকে সিগারেট পানে বাধ্য করেছি, কারণ সবাইকে হত্যা করে একজনকে বাঁচিয়ে রাখার মানে সাপ মেরে লেজ জিইয়ে রাখা।

জাহাজ 'নানহার' নাম বদলিয়ে আমার নামে নাম রাখলাম 'মিস্কো'।

মিস্কোতে একটি প্রাণীও আমি জীবিত থাকতে দেইনি। সবাইকে কৌশলে হত্যা করেছি। হত্যা করেছি সবাইকে। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি আজ শুধু মিস্কোর মালিক নই আলকা মিস্কোর আরও চারটি জাহাজ আছে, আমি তারও মালিক।

আলকাকে হত্যা করার পর আমি দীর্ঘ সময় এই জাহাজে মালিক সেজে বসেছিলাম। তখন মনে উদ্বেগ ছিলো এখন আর তা নেই। আমি—শুধু আমি—কিন্তু ওরা কারা যারা ভাসমান ভেলায় আমার জাহাজখানার দিকে এগিয়ে আসছে?

আমিও আমার জাহাজখানাকে এগিয়ে নিচ্ছি। ওরা যেন সহজে আমার জাহাজে উঠে আসতে পারে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভেলায় একজন পুরুষ ও আর একজন নারী রয়েছে।

আমি চাই এ নারীটিকে, তাই আমার এতো আগ্রহ ওদের তুলে নিতে জাহাজে।

ওদের ভেলাখানা সমুদ্রের ঢেউ ভেদ করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তরুণীটি অতীব সুন্দরী। আমি যেমনটি চেয়েছিলাম ঠিক তেমনি।

ভেলাটা আমার জাহাজের সংলগ্ন হয়ে এসেছে।

এবার আমি ঝুলন্ত সিঁড়ি নামিয়ে দেবো ভাবছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, পুরুষটি দুসাহসী কম নয়—তরুণীটিকে নিয়ে সে আমার জাহাজের গা বেয়ে উপড়ে উঠে আসছে।

কি আশ্চর্য লোকটা, একটা মানুষ কাঁধে নিয়ে চলন্ত জাহাজে অনায়াসে উঠে এলো। খুব শক্তিশালী পুরুষ বলে মনে হচ্ছে। ওকে হত্যা না করে জীবিত রাখবো এবং আমার সঙ্গী করে নেবো। অনুচর ছাড়া চলা মুশকিল, কাজেই লোকটাকে আমি পছন্দ করছি...

কিন্তু সে যদি কোনো অসাহযোগিতা করে তা হলে রক্ষা পাবে না আমার কাছে, আমি তাকে আমারই চেহারার মত লোহার মানুষ যা আমি নিজেই তৈরি করেছি তাকে দিয়ে হত্যা করবো।

ওরা গোটা জাহাজ ঘুরেফিরে দেখছে।

জাহাজে কোনো জনপ্রাণী চলছে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে ওরা। জাহাজখানা আপনা আপনি চলছে দেখে ওরা বিস্মিত হয়েছে, সন্ধান করে ফিরছে ওরা ক্যাবিনে ক্যাবিনে।

প্রথম ক্যাবিনে প্রবেশ করেই ভীষণ ভীত আর আতঙ্কিত হয়েছে ওরা দু'জন। এবার দ্বিতীয় ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। এ ক্যাবিনে ন' জন ছিলো সবাই মৃত্যুবরণ করেছে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে ওদের লাশগুলো।

তরুণী দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি আমার আসনে বসে সব দেখতে পাচ্ছি। সবকিছু শুনতে পাচ্ছি। কারণ আমার সম্মুখে রয়েছে বিস্ময়কর টেলিভিশন সেট।

আমার সম্মুখে রয়েছে আরও কয়েকটি সুইচ।

এক একটা সুইচের কাজ এক এক ধরনের। আমি আলকা মিস্কোর নিকট থেকে সবগুলো সুইচের কাজ জেনে নিয়েছিলাম, তাই কোনো অসুবিধা হয় না আমার।

লৌহমানবটির দ্বারা আমি ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে পারি কিন্তু ওকে এখনও কাজে লাগাবো কিনা ভাবছি। ওরা দু'জন মৃতদেহগুলো দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। বেশি ভয় পেয়ে গেছে তরুণটি।

আমি জানি না ওদের সম্পর্ক।

ওরা স্বামী-স্ত্রী কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। অবশ্য বয়স হিসেবে অন্য সম্পর্কও হতে পারে। তা যাই হোক আমি ঐ তরুণীকে আমার নিজের করে নেবো। তার জন্য যদি ঐ ভদ্রলোক বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি তাকে হত্যা করবো...

এরপর আর লিখবার সময় হয়তো হয়নি মিস্কোর তার নিজ কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, লৌহমানবের দ্বারা গ্যাস পাইপ বিধ্বস্ত হয়ে তার ঝুলন্ত ক্যাবিনের সব মেশিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তার সঙ্গে মিস্কো ও নিহত হয়েছে। ফুল্লরা এখন এ জাহাজের মালিক শুধু তুমি আর আমি। এই ডায়রীখানা সে কাছে না রাখার জন্য রক্ষা পেয়েছিলো, নইলে ডায়রীখানা ছিন্নভিন্ন হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হতো—আমরা কিছুই জানতে পারতাম না।

একটু থেমে বললো বনহুর—এখন বাঁচবার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

ফুল্লরা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বললো—নরপশু মিস্কোর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি। এখন আমার মরতে ভয় নেই বাপুজী। তাছাড়া তুমি আছো পাশে......

ফুল্লরা!

বলো?

নরপশুটা বুঝি তোমার উপর খুব অবিচার করেছে?

হাঁ, আমাকে সে হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। কুৎসিত আচরণে আমাকে বশীভূত করার চেষ্টা করতো কিন্তু আমি আমার দাঁত দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছি। আমার দেহ স্পর্শ করতে পারেনি নরপশু, তবে এমনি করে কতদিন রেহাই পেতাম জানি না! বাপুজী, তুমি না বলো আল্লাহ যদি সহায় থাকেন তাহলে কোনো শক্তিই তাকে ধ্বংস করতে পারে না......

ঠিক ফুল্লরা, তাই।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, ফুল্লরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—বাপুজী, ঐ দেখো একখানা জাহাজ এদিকে আসছে।

বনহুর ডায়রীখানা হাতের মুঠায় চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো এবং তাকালো সম্মুখে। আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো বনহুর—জাহাজখানা এদিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ফুল্লরা তো খুব খুশি এ জাহাজে সে হাঁপিয়ে উঠছিলো। জাহাজখানা তাদের মনে বাঁচার আশ্বাস এনে দিলো।

ক্রমে জাহাজখানা এগিয়ে আসছে।

বনহুর জামা খুলে নাড়তে লাগলো।

ফুল্লরা আঁচল উড়াতে লাগলো ভাল করে।

❑

জাহাজখানা নিকটবর্তী হতেই বনহুব বুঝতে পারলো এ জাহাজখানা যাত্রীবাহী জাহাজ। এবার তারা নিশ্চিন্তভাবে এ জাহাজ ত্যাগ করে ঐ জাহাজে যেতে পারবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা তাদের জাহাজের গায়ে এসে লাগলো।

ডেকে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লক্ষ্য করছিলো বনহুর আর ফুল্লরাকে। একজনের হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিলো, সেই ব্যক্তিকে ক্যাপ্টেন বলে মনে হলো।

বনহুর আর ফুল্লরাকে তারা নিজেদের জাহাজে তুলে নিলো। ক্যাপ্টেন ও জাহাজের যাত্রীরা খুব খুশি হলো। এরা না থাকলে ঐ জাহাজের মত তাদের জাহাজেরও অবস্থা হতো। কারণ তারা জানতে পারলো ঐ জাহাজখানা কোনো ডুবু দ্বীপের সঙ্গে আটকে পড়েছে।

বনহুর আর ফুল্লরাকে তুলে নিয়ে জাহাজখানা তাদের গন্তব্য স্থানের দিকে রওয়ানা দিলো।

ফুল্লরা আর বনহুরকে প্রথমে তারা পৃথক এক ক্যাবিনে রেখে তাদের চিকিৎসা করলো। নানা ধরনের ওষুধপত্র দ্বারা সুস্থ করে তুললো ওদের দু'জনাকে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন মাওলুং বড় ভাল লোক। তিনি বনহুর আর ফুল্লরাকে যত্নসহকারে নিজ জাহাজে আশ্রয় দিলেন। চিকিৎসা ছাড়াও পোশাক পরিচ্ছদ এবং যা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই দিলেন।

বনহুরকে সিগারেটও দিলেন ক্যাপ্টেন মাওলুং। বড় ভাল লোক তবে ইংরেজি খুব ভাল তিনি বলতে এবং বুঝতে পারেন না।

ক্যাপ্টেন রিজার্ভ ক্যাবিনে বনহুর আর ফুল্লরাকে থাকতে দিলেন এবং নিজ পোশাক পরিচ্ছদ দিলেন বনহুরকে পরবার জন্য; কারণ বনহুরের সার্টপ্যান্ট ছিঁড়ে গিয়েছিলো স্থানে স্থানে।

ফুল্লরার পোশাকের অবস্থাও করুণ তবু সে চালিয়ে নিচ্ছিলো কোনো রকমে।

জাহাজখানা তাদের সেই নিশ্চল জাহাজখানাকে ত্যাগ করে বহুদূরে এগিয়ে এলো। চারিদিকে অথৈ জলরাশি, শুধু নীল আকাশ আর সমুদ্রে।

বনহুর ক্যাপ্টেন মাওলুংকে বন্ধুরূপে পেলেও ফুল্লরা কিন্তু কাউকে সাথী হিসেবে পেলো না।

সে একা একা বসে ভাবতো।

কি ভাবতে সে নিজেই জানে না।

একদিন ডেকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে সে সম্মুখের দিকে। শুধু জলরাশির শুভ্র ফেনা আর ঢেউগুলো ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছিলো না।

পিছনে এসে দাঁড়ালো বনহুর, বললো—কি ভাবছো ফুল্লরা?

ফুল্লরা ফিরে তাকালো কিন্তু কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর ফুল্লরার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—জানি তোমার আব্বু আর আম্মুর কথা মনে পড়েছে।

ফুল্লরার মনের কথাই বলেছে বনহুর, তবে আরও একটি মুখ ফুল্লরার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে বারবার, সে তার খেলার সাথী ছিলো—নাম ওর জাভেদ।

এত বিপদের মধ্যেও ফুল্লরা ভুলতে পারেনি তার সাথীকে। না জানি সে এখন কত বড় হয়েছে, কেমন দেখতে হয়েছে।

বনহুর বললো—ক্যাপ্টেন মাওলুং বড় ভাল মানুষ, তিনি আমাদের বিপদের কথা শুনেছেন। তিনি আমাদের পৌঁছে দেবেন......

উচ্ছল আনন্দে বলে উঠলো ফুল্লরা—সত্যি ক্যাপ্টেন আমাদেরকে কান্দাই আব্বু আম্মুর কাছে পৌঁছে দেবেন?

হেসে বললো—পাগলী মেয়ে, উনি কেন কান্দাই পৌঁছে দিতে যাবেন? উনারা যে বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করবেন আমরা সেই বন্দরে অবতরণ করবো। তারপর আমরা রওয়ানা দেবো কান্দাই এর পথে।

কিন্তু কিসে যাবো আমরা?

প্লেনে যেতে হবে।

তাহলে তো অনেক টাকা-পয়সার দরকার?

হাঁ।

কোথায় যাবে?

বনহুর বললো—তা ঠিক, অনেক টাকার দরকার......

তুমি ভেবো না বাপু, আমার গলায় সাত রাজার ধন নীলমনি আছে, ওটা তুমি বিক্রি করে দাও বাপু।

ফুল্লরা, ওটা আছে এখনও তোমার কাছে?

কেন, তুমি কি মনে করেছো ওটা আমি হারিয়ে ফেলেছি?

ঠিক তা নয়, আমি মনে করেছি ঐ নরপশুটা হয়তো তোমার নীলমনি হার ছিনিয়ে নিয়েছে।

না, সে সুযোগ পায়নি নরপশুটা। আমি অতি সাবধানে জামার ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

হেসে বললো বনহুর—তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে ফুল্লরা। আমি ভেবেছিলাম নীলমনি হার এবার তুমি হারিয়ে ফেলেছো। যাক্ ওটা যখন তোমার কাছে আছে তখন ওটা আমার নষ্ট হবে না।

ওটা তোমার আশীর্বাদ বাপুজী।

ফুল্লরা, আশীর্বাদই যদি হবে, তবে ঐ নীলমনি হারটার জন্যই তুমি এত কষ্ট পাবে কেন? মালোয়া তোমাকে চুরি করেছিলো ঐ নীলমনি হারের জন্যই!

তা আমি বিশ্বাস করি না বাপুজী। মালোয়া আমাকে চুরি করে নিজেও রেহাই পেলো না। মৃত্যু ঘটলো তার কিন্তু আমার নীলমনি হার আমারই আছে। আমি জানি কেউ কোনোদিন নীলমনি হার আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

ফুল্লরার মুখমন্ডল দীপ্ত হয়ে উঠে।

আরও দুটো দিন কেটে গেলো।

ক্যাপ্টেন জানিয়ে দিলো আগামীকাল তাদের জাহাজ 'হিরোমা' বন্দরে পৌঁছবে। হিরোমা বন্দরে একদিন কাটানোর পর জাহাজখানা রওয়ানা দেবে 'নিশো' দ্বীপের দিকে।

বনহুর ফুল্লরাকে বললো ফুল্লরা, তুমি হিরোমায় অবতরণ করতে চাও না নিশো দ্বীপে?

কতদিন মাটির স্পর্শ পাইনি, মনটা আমার মাটির স্পর্শ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে......

তাহলে তুমি হিরোমা বন্দরেই অবতরণ করতে চাও?

হাঁ, বাপুজী।

বেশ, তাই হবে।

ফুল্লরার মনে উচ্ছল আনন্দ বয়ে চলেছে। নাচগান করা তার অভ্যাস আছে, পা দু'খানা নাচতে চাইছে, গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে গানের সুর।

ফুল্লরা তাই নির্জন ডেকে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলো।

পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

কিছুক্ষণ কোনো কথাই সে বললো না, মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরা ফিরে তাকাতেই লজ্জায় মাথা নিচু করে নিলো। কখন যে বাপুজী এসে দাঁড়িয়েছে জানে না সে।

ফুল্লরা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো—যেও না ফুল্লরা, ভারী সুন্দর লাগছিলো তোমার গানের সুর। গাও না একটা গান.......

ফুল্লরা বললো—বাপুজী, তুমি গান শুনবে?

হাঁ গান শুনবো, গাও ফুল্লরা।

ফুল্লরা গান গাইতে শুরু করলো।

ফুল্লরার কণ্ঠ ছিলো অপূর্ব।

সুরের ঝংকারে অভিভূত হয়ে পড়লো বনহুর।

কখন যে তার চারপাশ ঘিরে এসে জড়ো হয়েছে জাহাজের যাত্রিগণ, খেয়াল করেনি ফুল্লরা বা বনহুর। এমন কি ক্যাপ্টেন মাওলুংও এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে।

ফুল্লরার গানের সুরে সবাই আত্মহারা।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দধ্বনি করে উঠলো সবাই। করতালিতে মুখর হলো জাহাজের ডেকখানা।

সম্বিৎ ফিরে পেলো ফুল্লরা।

বনহুর ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হলো, কারণ ডেকভর্তি হয়ে গেছে। সবাই করতালি দিচ্ছে।

জাহাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর যাত্রী মিঃ বারবারও এসেছেন। তিনি নিজ কণ্ঠ থেকে একছড়া মূল্যবান মতির মালা খুলে ফুল্লরাকে উপহার স্বরূপ ছুড়ে দিলেন।

বনহুর বিস্মিত না হলেও একটু অবাক হলো, কারণ একটা গানের বিনিময়ে এত মূল্যবান মতিমালা দেওয়াটা যেন কেমন লাগছে।

বনহুর শুধু একটিবার বারবারার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো ক্যাপ্টেনের মুখে।

বারবারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—আমি হিরোমাবাসী। কাজেই আমাকে হিরোমা বন্দরে অবতরণ করতে হবে। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই মহান অতিথিদ্বয়কে।

ফুল্লরা বারবারার কথা বুঝতে পারলো না, কারণ সে ইংরেজিতে কথা বলছিলো—তাই তাকালো সে বনহুরের দিকে।

বনহুর হেসে বললো—ফুল্লরা, তোমাকে উনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

কথাটা শুনে মিঃ বারবারা বললেন—শুধু উনি নন, আপনিও আমার আমন্ত্রিত।

বনহুর কোনো জবাব দেবার পূর্বেই বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন—মিঃ বারবারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, কাজেই তাঁর কথা কেউ ফেলতে পারেন না।

পরদিন যথাসময়ে জাহাজখানা হিরোমা বন্দরে নোঙ্গর করলো। যারা হিরোমাবাসী তারা অবতরণ করতে শুরু করলো।

ফুল্লরা আর বনহুর মিঃ বারবারার অতিথি হিসেবে তার গাড়িতে গিয়ে বসলো।

সম্পূর্ণ অজানা দেশ।

মিঃ বারবারার গাড়িতে বসে বনহুর অবাক হলো, কারণ গাড়িখানা একেবারে নতুন ধরনের। এমন গাড়ি সে দেখেনি কোনোদিন।

শুধু গাড়ি নয়, হিরোমা বন্দরে অবতরণ করার পর সব কিছুই আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে বনহুর আর ফুল্লরার কাছে। বন্দরখানা আমাদের দেশের বন্দরের মত নয়। ভাসমান একটি বন্দর। জাহাজগুলো সেই ভাসমান বন্দরের চার পাশে ঘিরে নোঙ্গর করছে।

জাহাজ থেকে ঝুলন্ত সিঁড়ি নামিয়ে ভাসমান বন্দরে অবতরণ করেছিলো যাত্রীগণ। সে এক অদ্ভুত উপায়ে অবতরণ, বিস্মিত হয়েছিলো বনহুর। এমন করে তো কোনোদিন দেশের বন্দরে অবতরণ করতে হয় না।

বনহুর গাড়িতে বসে ভাবছিলো এবং ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো পথের দু'পাশ।

পথের দু'পাশে সারি সারি পিরামিড ধরনের মনুষাকৃতি দালানকোঠা। খুব সুউচ্চ নয়, মাঝারি গোছের এই দালান কোঠাগুলোকে কতকটা উইপোকার বাসার মত লাগছে।

বনহুর ফুল্লরার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলো।

পথের ধারের বাড়িগুলো তাদের বেশি বিস্মিত করেছিলো। আরও একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার, লোকজন পথের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে আর গাড়িগুলো পথের দু'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে পুল বা সাঁকো আছে, ঐ সাঁকো বা পুল দিয়ে পথচারিগণ পারাপার হচ্ছে।

লোকজনের পোশাক পরিচ্ছদও অদ্ভুত ধরনের। গলা থেকে পা পর্যন্ত একই গাউনে ঢাকা। মাথায় লম্বা টুপি, পায়ে জুতো।

সবার হাঁটার কায়দা কেমন যেন বেখাপ্পা ধরনের। সবাই কেমন যেন দুলে দুলে হাঁটছে।

পথের ধারে কোনো দোকান দেখা যাচ্ছে না।

তবে অনেকের হাতে ঝুড়ি আছে এবং ঝুড়িভর্তি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। বনহুর বললো—ফুল্লরা, এদের দেশটা বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

হাঁ, আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে।

দেখছোনা গাড়িঘোড়া যানবাহনগুলো যাচ্ছে দু'ধার দিয়ে আর লোকজন যারা পথচারী তারা চলেছে মাঝপথ দিয়ে। আবার দেখো পথের ধারে যে বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোনো দোকান বা হোটেল আছে বলে মনে হয় না কিন্তু প্রায় লোকের হাতের ঝুড়িতেই রয়েছে নিত্য দরকারি জিনিসপত্র।

তাই তো পথের ধারে কোনো দোকানপাট নেই অথচ সবাই জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

বনহুর বললো—তাহলে নিশ্চয়ই এসব দালান-কোঠার অন্তরালে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান।

বনহুর আর ফুল্লরা যখন কথাবার্তা বলছিলো তখন মিঃ বারবারা তাকাচ্ছিলেন ফুল্লরা আর বনহুরের দিকে। ওরা কি বলছে ঠিক বুঝতে পারছিলেন না তিনি।

বনহুর বললো—লোকটি অত্যন্ত চালাক, বুঝলে?

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে।

ফুল্লরা, সাবধান নতুন দেশ, যেমন দেখছো নতুন ধরনের গাড়ি।

ফুল্লরা বললো—আমি এমন গাড়িতে কোনোদিন চাপিনি, গাড়িখানার দুটি পাখা আছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, ঠিক ধরেছো এ গাড়ি পানিতে চলে এবং হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। সম্মুখে যে বোতামগুলো দেখছো ঐ বোতাম টিপলেই দু'পাশে দুটো পাখা বেরিয়ে পড়বে।

আশ্চর্য!

হাঁ, আশ্চর্য বটে তবে আরও আশ্চর্য মিঃ বারবার।

নিজের নাম তার অতিথিদের একজনের মুখে শুনে ফিরে তাকালেন বারবারা।

বনহুর হেসে বললেন—আপনার বাড়িটা বড় সুন্দর, তাই ও বলছিলো।

হাসলেন বারবারা।

তারপর নীরবে গাড়িখানা চলতে লাগলো।

হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর আর ফুল্লরা, গাড়িখানা একটা বিরাট উঁচু দেয়ালের সম্মুখে এসে থেমে গেলো।
ফুল্লরা আর বনহুর মুখ চাওয়া-চাওরি করে নিলো।
মিঃ বারবারা বললেন—বড় আশ্চর্য লাগছে, না?
বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—আপনি বাংলা জানেন?
হেসে বললো বারবারা—বাংলাই যদি না জানবো তাহলে আপনাদের দু'জনকে এভাবে আমন্ত্রণ জানাবো কেন?
বনহুর আর ফুল্লরার চোখে বিস্ময় ঝরে পড়লো।
ততক্ষণে প্রাচীরের সম্মুখে একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।
গাড়িখানা চুপসে যাওয়ার মত ছোট্ট হয়ে গেলো, তারপর অনায়াসে প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গটির মধ্যে।
বললেন বারবারা—এই আমার বাসস্থানের পথ।
বনহুর বললো—আশ্চর্য বটে।
আরও আশ্চর্য হবেন আমার বাসস্থান দেখে!
এত সুন্দর আপনি বাংলা বলতে পারেন ভাবতেও পারিনি! বললো বনহুর।
হাসলেন বারবারা।
এত দ্রুত গাড়িখানা এগিয়ে চলছিলো যে, দু'পাশের কিছু নজর পড়ছিলো না।
কেমন ঘোলাটে অন্ধকার।
বনহুর আর ফুল্লরা আতঙ্কিত হচ্ছিলো, যে কোনো মুহূর্তে ধাক্কা খেয়ে গাড়িখানা থেতলে যেতে পারে।
কিন্তু তা হলো না।
গাড়িখানা থেমে গেলো।
আশ্চর্যজনক এক অট্টালিকা ঠিক অট্টালিকা নয়—ভিতরে একটা বিরাট গুহা। পিরামিডের অভ্যন্তর যেমন পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনি।
বনহুর আর ফুল্লরাকে নিয়ে বসালো পাশাপাশি দুটো চেয়ারে।
বনহুর আর ফুল্লরা অবাক হয়ে দেখছে।
প্রশস্ত মেঝেতে নানা ধরনের চেয়ার।
বনহুর আর ফুল্লরাকে যে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছে সে চেয়ার দুটো একটু অন্য ধরনের। স্বাভাবিক চেয়ারের মত নয়।
বনহুর লক্ষ্য করলো কক্ষটার দেয়ালের চারপাশে কাঁচের আলমারী। আলমারীর মধ্যে নজরে পড়তেই বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো। কাঁচের আলমারীর মধ্যে সারি সারি রয়েছে 'মমি' ধরনের কোনো বস্তু।

বনহুরকে ঐদিকে অবাক হয়ে থাকতে দেখে মিঃ বারবারা বললেন—ওগুলোও আমার অতিথি!

কথাটা বড় রহস্যজনক বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। বারবারার আমন্ত্রণ বনহুর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি। করেছে কতকটা বাধ্য হয়ে। ক্যাপ্টেনের অনুরোধেই সে ফুল্লরাসহ বারবারার আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য কথা দিয়েছিলো। তা ছাড়াও আরও একটা কথা ভেবেছিলো বনহুর তারা তো এখন দিশেহারা পথিক হিরোমা বন্দরে তার পরিচিত কেউ নেই, এমন কি হিরোমা শহরেও কেউ নেই যার আশ্রয়ে এসে দাঁড়াবে তারা। ফুল্লরা সঙ্গে না থাকলে এত ভাবতে হতো না তাকে। নিজকে সে হারিয়ে ফেলতো জনগণের ভীড়ে।

কিন্তু অজানা অচেনা দেশ....

বললো বারবারা—কি ভাবছেন?

বনহুর বললো—ভাবছি না, দেখছি।

ও, ঐ মমিগুলো?

হাঁ, ওগুলো কি....

আমার অতিথিদের মমি—আমি তাদের নষ্ট হতে দেইনি, দেবো না কোনোদিন। ঐ দেখছেন না কত যত্ন করে কাঁচের আবরণের মধ্যে রেখেছি...

বনহুর তাকিয়ে দেখলো ফুল্লরার মুখমন্ডল কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই বারবারার কথাগুলো ফুল্লরা বুঝতে পেরেছে। বনহুর ফুল্লরার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বারবারার দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—মিঃ বারবারা, আমরা আশা করি না আপনার ঐ কাঁচের আবরণের মধ্যে মমি হয়ে থাকবো।

মিঃ বারবারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

বনহুর ও ফুল্লরা বিস্মিত হয়ে তাকালো, কারণ মিঃ বারবারার হাসিটা অস্বাভাবিক ছিলো। তারা ভাবতেও পারেনি এই মহৎ ব্যক্তিটির খোলসের অন্তরালে এক বীভৎস রূপ লুকিয়ে ছিলো।

মিঃ বারবারা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর আসন ছেড়ে বললেন—আসুন, আমার অতিথি বন্ধুদের মমিগুলো আপনাদের দেখাই।

বনহুর ও ফুল্লরা নিশ্চুপ।

বললেন বারবারা—কই আসুন! একটু থেমে পুনরায় বললেন—এত সহজে আপনাদের মমি বানাবো না। কারণ এখনো আপনার সঙ্গিনীর গান শোনা হয়নি। আপনারা আমার অতিথি, কিছু পানাহার করানোর দরকার বলে মনে করছি। বলুন কি ধরনের খাদ্য পরিবেশন করবো?

এতক্ষণ বনহুর নীরব ছিলো, এবার কথা না বলে পারলো না। বললো সে—আপনি আমাদের বন্ধু। আশা করি রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবেন।

এবার বললো বারবারা—শুধু বন্ধুই নয়, অতিথি আপনারা। কাজেই ....এগিয়ে গেলো বারবারা একটা আলমারীর পাশে। আলমারীর গায়ে বেশ কয়েকটা সুইচ বসানো ছিলো, তার একটাতে চাপ দিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের আলমারীর দরজা খুলে গেলো। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো আলমারী থেকে। তার হাতে একটা খাবারের থালা। থালাটা কালো কাপড়ে ঢাকা ছিলো। মমিটা সোজাসুজি এসে দাঁড়ালো ফুল্লরা আর বনহুরের সামনে।

মিঃ বারবারাও এসে দাঁড়িয়েছে জীবন্ত মমিটার পাশে। কালো কাপড়টা একটানে সরিয়ে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো ফুল্লরা।

বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো জীবন্ত মমির হাতের রেকাবিখানার দিকে। দেখলো একটা দ্বিখন্ডিত হৃৎপিন্ড।

বললো বারবারা—খান।

বনহুর তখন তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বারবারার মুখের দিকে। কঠিন কণ্ঠে বললো—বনহুর—এটাই কি আপনার উপযুক্ত খাবার।

বললো বারবারা—হাঁ।

কিন্তু আপনাকেও এটা খেতে হবে।

বারবারা হেসে বললো—ওটা নতুন কিছু নয়। মানুষের হৃৎপিন্ড খাওয়াই আমার নেশা! আপনারাও একটু স্বাদ গ্রহণ করুন। এই যে মমিগুলো দেখছেন.....আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন বারবারা তাঁর কক্ষের চারদিকের কাঁচের আবরণের মমিগুলো। এদের প্রত্যেকের হৃৎপিন্ডই আমি খেয়েছি, কাজেই আমার ব্যাপারে এটা নতুন নয়। আপনারা যদি এর স্বাদ গ্রহণ করেন তাহলে কোনো দিনই অবহেলা করতে পারবেন না আমি জানি। নিন...

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর মমির গায়ে প্রচন্ড এক ধাক্কা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মমিটা ছিটকে পড়লো দূরে।

একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেলো। প্রত্যেকটা কাঁচের আলমারীর আবরণ খুলে গেলো এবং মমিগুলো বেরিয়ে এলো কাঁচের আলমারী থেকে।

চিৎকার করে উঠলেন মিঃ বারবারা।

বনহুর ও ফুল্লরা দেখলো মমিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে বারবারাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

ফুল্লরা ভীষণ ভীত হয়ে বনহুরকে ঘেঁষে দাঁড়ালো, বনহুর বললো—চলো ফুল্লরা, এখান থেকে পালিয়ে যাই। মমিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বনহুর ও ফুল্লরা দৌড়ে গেলো দরজার দিকে।

ঠিক ঐ সময় বারবারা অপর একটি সুইচে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর ও ফুল্লরা আটকা পড়ে গেলো। তারা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে মমিগুলো যেন সারা কক্ষে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

বারবারা আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তার লক্ষ্য মেঝেতে পড়ে যাওয়া মমিটার দিকে। কোনো রকমে সে ঐ মমি টাকে দাঁড়করানোর চেষ্টা করছে।

ফুল্লরা ভীষণ ভীত হয়ে বনহুরকে আঁকড়ে ধরে আছে।

বললো বনহুর—ভয় নেই ফুল্লরা, ঐ মমিগুলো ছুটোছুটি করলেও ওদের প্রাণ নেই।

ফুল্লরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—তবে যে ওরা ছুটোছুটি করছে!

বললো বনহুর—একটু পরেই সব জানতে পারবে ফুল্লরা।

ততক্ষণে মিঃ বারবারা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন প্রথম মমিটাকে। মমিটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মমিগুলো নিজ নিজ স্থানে ফিরে চললো।

এবার মিঃ বারবারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—আজ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে পুনরায় বললে—আমি জানতাম আপনারা সরল মানুষ। কিন্তু আপনারা যে এত অপদার্থ তা জানতাম না। আর একটু হলেই আমার মৃত্যু ঘটিয়ে ছাড়তেন আপনারা। ঐ মমিগুলোর হৃৎপিন্ড আমি খেয়েছি। তাই তারা আমাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। ভাগ্যিস্ এক নম্বর মমিটাকে ঠিক সময়মত তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম, তাই জীবনে বেঁচে গেলাম। হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন বারবারা।

বনহুর বললো—মিঃ বারবারা, আমরা আপনার অতিথি, কাজেই আপনি আমাদের বন্ধু। আপনার সঙ্গে আমার কোনো মনোমালিন্য থাকার কথা নয়, যা চাইবেন তাই করতে রাজি আছি আমরা।

সত্যি বলছেন? মিঃ বারবারা বললেন।

বললো বনহুর—হাঁ সত্যি।

মিঃ বারবারা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলেন বনহুরের সঙ্গে। এবার আসন গ্রহণ করার জন্য মিঃ বারবারা অনুরোধ জানালেন।

বনহুর ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো—বসো ফুল্লরা, আশা করি মিঃ বারবারা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। আমরা তাঁর বন্ধু...শত্রু নই।

ফুল্লরা আসন গ্রহণ করার পূর্বে ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো মিঃ বারবারার মুখে।

মিঃ বারবারা বললেন—আপনারা বন্ধু হলেও আমার বন্দী, একথা কোনো সময় ভুলে যাবেন না। কারণ, এই মমিগুলোর মতই আপনারা চিরদিন আমার এই কক্ষের শোকেসে সাজানো থাকবেন।

বললো বনহুর—তাতে দুঃখ নেই আমার মোটেই। এ নশ্বর দেহ একদিন যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হবেই তার চেয়ে আপনার শো-কেসে মমি হয়ে থাকা অনেক শ্রেয় বলে আমি মনে করি। কি বলো ফুল্লরা, তাই নয় কি?

ফুল্লরা কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বললো পুনরায়—মিঃ বারবারা, আমরা আপনার বন্ধু এবং বন্দী, কাজেই এখান থেকে বের হবার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ বলা যায়।

হাঁ, সে কথা সত্য!

মিঃ বারবারা, আপনি কিন্তু এত সুন্দর বাংলা বলতে পারেন এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। যাক সে কথা, এবার বলুন দেখি আপনার মমিগুলো জীবন্ত হলো কি করে?

সে কথা আপনার জেনে লাভ?

মমি হয়েই যখন থাকতে হবে আপনার শো-কেসে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

ও, আপনার জানতে ইচ্ছে করে কি করে মমিগুলো জীবন্ত হলো?

হাঁ মিঃ বারবারা।

মমিগুলোর পায়ের নিচে চাকা লাগানো আছে এবং প্রতিটি মমিতে কারেন্ট ফিট্ করা আছে। কোনোক্রমে একটা মমি যদি আপনার দেহে স্পর্শ করে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রথমে মমির সঙ্গে সংযোগ করা আছে প্রতিটি মমির ইলেকট্রিক কারেন্ট, বুঝেছেন?

হাঁ, এবার বুঝলাম সবকিছু। বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমিও ঐ রকম মমি বনে যাই।

তা মন্দ হবে না।

সেজন্যই প্রস্তুত রইলাম। হাঁ, ফুল্লরার গান শুনবেন বলেছিলেন?

মিঃ বারবারার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আনন্দে, তিনি বললেন—গান শুনবো বলেই্ তো আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছি এবং গান শোনার পর......

যাক্ সে কথা, পরে শোনা যাবে। আগে গান শোনা হোক ফুল্লরা, নাও আরম্ভ করো দেখি। তবে শুধু গান নয়, নাচও দেখাবে, কেমন?

বাপুজী!

হ্যাঁ ফুল্লরা, তোমাকে গাইতে হবে, নাচতে হবে।

বাপুজী তুমি......

আমি বলছি গাও ফুল্লরা।

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়, তুমি গাও, আমরা শুনবো।

ফুল্লরা অবাক চোখে কিছুক্ষণ বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কম্পিত গলায় গাইতে শুরু করলো সে।

ফুল্লরা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে সুরের ঝংকার ঝরে পড়লো।

গান গেয়ে চললো ফুল্লরা।

বারবারার চোখে মোহ, সে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকাচ্ছে।

বনহুর লক্ষ্য করছে বারবারাকে।

নরপশু বারবারা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। সে হারিয়ে ফেলছে স্বাভাবিক সত্তা। ফুল্লরার গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বারবারা দু'হাত প্রসারিত করে ফুল্লরাকে আঁকড়ে ধরতে গেলো।

ফুল্লরা ভীত হরিণীর মত লুকালো বনহুরের কোলের কাছে।

বারবারা তখন নরপশুর মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো দিয়ে যেন লালসা ঠিকরে বের হয়ে আসছে। ভীষণ একটা জন্তুর মত আক্রমণ করতে যাচ্ছে বারবারা ফুল্লরাকে।

খপ্ করে ধরে ফেললো ফুল্লরার ডান হাতখানা মিঃ বারবারা।

বনহুর অমনি ওর চোয়ালে প্রচন্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়লো মিঃ বারবারা।

বনহুর আর ফুল্লরা বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুলো কিন্তু দরজা বন্ধ।

মিঃ বারবারা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দু'চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মিঃ বারবারা উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছে নিয়ে হাতখানা চোখের সামনে তুলে ধরলো।

তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত।

এমন করে তাকে পরাজয় বরণ করতে হবে কোনোদিন ভাবতে পারেনি মিঃ বারবারা। ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠলো এবং একটা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা তুলে নিলো ওপাশের টেবিল থেকে দ্রুতহস্তে।

বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুল্লরা। ভয় আর দুর্ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে। বললো ফুল্লরা—এখানে কেন এলে? এই ভয়ঙ্কর লোকটার আমন্ত্রণ তুমি কেন গ্রহণ করলে বাপুজী?

কিন্তু ততক্ষণে নরপশুটা সূতীক্ষ্ণ ছোরা নিয়ে প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুরের উপর লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়তেই বনহুর খপ্ করে ধরে ফেললো ওর ছোরাসহ হাতখানা।

ভীষণ জোরে মোচড় দিলো বনহুর মিঃ বারবারার ছোরাসহ হাতে।

ছোরাটা ঘসে পড়লো মেঝেতে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বারবারার নাক লক্ষ্য করে ঘুসি বসিয়ে দিলো।

মিঃ বারবারা ঘুরপাক খেয়ে পড়লো।

নাক দিয়ে তাজা রক্তের ফিন্কি বেরিয়ে এলো।

বনহুর ফুল্লরার হাত ধরে ছুটে গেলো ওদিকের সুইচগুলোর পাশে কিন্তু সুইচে হাত দেবার পূর্ব মুহূর্তেই পিছনে ভারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো—খবরদার, সুইচে হাত দিও না।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ হলো—ক্যাপ্টেন মাওলং......

হ্যাঁ আমি।

আপনি বাংলা জানেন?

বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা না হলেও বাংলাদেশে অনেক দিন ছিলাম কিন্তু ভাষা নিয়ে এখন আলোচনা করতে আসিনি......

তা বেশ বুঝতে পেরেছি ক্যাপ্টেন মাওলুং। আপনার চমৎকার ভদ্র অভিনয়ের জন্য ধন্যবান। আপনি যে আমাদের এভাবে ধোঁকা দেবেন এটা ভাবতে পারিনি। এখন সব পানির মত পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

যে জাহাজখানা থেকে তোমাদের তুলে নিলাম ও জাহাজখানা আমাদের। আমরা বিপদ সংকেত পেয়েই রওনা দিয়েছিলেম এবং উপস্থিত হয়ে যখন জানতে পারলাম সব শেষ হয়ে গেছে তখন তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা ছাড়া কিছু করা উচিত মনে করলাম না।

বললো বনহুর—আপনি চালাক ও বুদ্ধিমান বটে। আচ্ছা একটি কথা বলবেন কি?

তোমরা আমাদের বন্দী, কাজেই বলতে বাধ্য নেই। যাত্রী হিসেবে যাদের তোমরা দেখেছো তারা সবাই আমাদের অনুচর। এক একজন এক এক বেশে জাহাজের যাত্রী হিসেবে জাহাজেই বিচরণ করে।

বনহুর একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো—হু!

ফুল্লরার মুখমন্ডল কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। এত আদর-আপ্যায়ন সব মিথ্যা! ক্যাপ্টেন মাওলুংকে ফুল্লরা কেন, বনহুর নিজেও সর্বান্ত করণে বিশ্বাস করেছিলো।.একজন মহৎ ব্যক্তি মনে করেছিলাম তাঁকে কিন্তু এখানে সবকিছু রহস্য ভেদ হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন মাওলুং বিশ্বাসঘাতক এ কথা ভাবতেও যেন কষ্ট হয়।

ক্যাপ্টেন মাওলুং বললেন—শুধু একটি নয়, পাঁচটি জাহাজ আমাদের নীলনদে বিচরণ করে ফিরছে। প্রতিটি জাহাজে আমাদের একশ' অনুচর আছে....এর বেশি আমি বললো না কিছু। শোনো, আর কোনো দিন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

ওদিকে ততক্ষণে নাকমুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়েছে বারবারা। উঠে দাঁড়িয়েই যখন সে দেখতে পেলো ক্যাপ্টেন মাওলুংকে তখন সে নতুন উদ্যমে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো। নাকমুখ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

হাত দিয়ে রক্ত মুছে নিয়ে বললো—বারবারা মাওলুং তুমি এসে গেছো তাহলে?

হাঁ, তোমরা চলে আসার পর আমি জাহাজ থেকে সবার অলক্ষ্যে নেমে পড়েছিলাম এবং সুস্থ সবল দেহে এসে পৌঁছে গেলাম। জানো ঠিক সময়মত এসে পৌঁছে গেছি, নইলে তোমার মুখে পরাজয়ের কালিমা মেখে ওরা পালিয়ে যেতো।

মিঃ বারবারা হেসে বললো—পালাবার পথ বন্ধ।

তা জানি তবু ওরা সরে পড়ার চেষ্টা করছিলো।

বারবারার সঙ্গে যখন ক্যাপ্টেন মাওলুং কথা বলছিলো তখন বনহুর কক্ষটার চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। দেয়ালের পাশ দিয়ে কাঁচের আলমারী, তার মধ্যে রয়েছে সারিবদ্ধভাবে মমিগুলো। কক্ষটি ঠিক কক্ষ নয়, পিরামিডের অভ্যন্তর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একপাশে সুউচ্চ ধরনের একটি মঞ্চ, তার উপরে রয়েছে কয়েকটি অদ্ভুত ধরনের গোলাকার বস্তু। বস্তুগুলো কি তা বুঝবার উপায় নেই। একপাশে কিছু জালা, জালাগুলোর মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে আঁকা রয়েছে নানা ধরনের জীবজন্তুর বীভৎস ভয়ংকর মূর্তি। জীবজন্তুগুলোর চোখগুলো যেন জীবন্ত

লাগছে। বনহুর এতক্ষণ ভালভাবে লক্ষ্য করেনি, এবার সে একনজরে সব দেখে নিলো।

বনহুর এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো ক্যাপ্টেন মাওলুংয়ের মুখে।

মাওলুং একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর বললো—ধন্যবাদ।

কেন, নাও পান করো।

প্রয়োজন নেই।

ক্যাপ্টেন মাওলুং বাধ্য হয়ে সিগারেট-প্যাকেটটা তুলে রাখলো পকেটে।

বনহুর এই অবস্থাতেও মৃদু হাসলো।

সে জানে ঐ সিগারেটগুলো কত ভয়ংকর। জাহাজ মিস্কোর আরোহিগণের মৃত্যুর কারণ ঐ সিগারেট। ক্যাপ্টেন মাওলুং মনে করেছে বনহুর জানে না কি ভাবে মৃত্যু ঘটেছিলো জাহাজ মিস্কোর যাত্রিগণের। তাই সে সিগারেট পান করতে দিলো বনহুরকে।

বনহুর সিগারেট পান না করার জন্য উপায় অবলম্বন করলো মাওলুং।

কিন্তু তার পূর্বেই মিঃ বারবারা চাপ দিলো অপর একটি সুইচে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্ররশ্মি বেরিয়ে এলো অদ্ভুত মেশিনটার ভিতর হতে। রশ্মিটা গিয়ে পড়লো বনহুরের চোখেমুখে।

বনহুর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

তার যন্ত্রণা হচ্ছে এটা বেশ বোঝা গেলো। কারণ দ্রুত সরে দাঁড়ালো সে সেখান থেকে। কিন্তু রশ্মিটা সঙ্গে সঙ্গে আবার আক্রমণ করলো তাকে।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে যাচ্ছে।

বারবারা রশ্মির হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চলেছে কিন্তু সে তার রশ্মি বনহুরের দেহে স্থিরভাবে নিক্ষেপ করতে পারছে না।

এবার ক্যাপ্টেন মাওলুং অপর একটি সুইচ টিপলো, অমনি উপর থেকে একটি খাঁচা এসে বন্দী করে ফেললো বনহুরকে। এবার বনহুর আর নড়াচড়া করতে পারছে না।

বারবারা হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে রশ্মিটা এবার বনহুরের দেহে নিক্ষেপ করলো।

একচুলও নড়তে পারছে না বনহুর।

ফুল্লরা বুঝতে পারলো বনহুরের খুব কষ্ট হচ্ছে।

যন্ত্রণায় বারবার মুখ ঢেকে ফেলছে এবং দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেলছে।

ফুল্লরা দৌড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন মাওলুংয়ের পা জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমি আপনার পা ধরে বলছি, রশ্মি বন্ধ করুন। বাপুজীকে মুক্তি দিন...বাপুজীকে মুক্তি দিন...

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বারবারা—হাঃ হাঃ হাঃ, আলোকরশ্মি বন্ধ করবো?

ছুটে গিয়ে ফুল্লরা বারবারার পা চেপে ধরলো—দয়া করুন! আপনারা দয়া করুন, ওর উপর থেকে আলোকরশ্মি সরিয়ে নিন। দয়া করুন মিঃ বারবারা।

দয়া করবো আমরা! কিছুতেই না, তিল তিল করে পুড়িয়ে মারবো ওকে। আর তোমাকে জীবিত রেখে উপভোগ করবো তোমার রূপ-যৌবন! ও আমার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের করেছে, আমি ওর দেহের চামড়া গলিয়ে চর্বি বের করবো।

ফুল্লরা কেঁদে বললো—কি অপরাধ আমরা করেছি? কি অপরাধ আমরা করেছি যার জন্য আপনারা আমাদের উপর এমন নির্মম ব্যবহার করছেন?

অপরাধ তুমি করোনি সুন্দরী, অপরাধ করেছে তোমার ঐ সঙ্গীটি। যার জন্য তুমি আমাদের পা স্পর্শ করতে বাধ্য হচ্ছো। আমার বন্ধুকে সে হত্যা করেছে।

না না, ও কাউকে হত্যা করেনি! করুণ কণ্ঠে বললো ফুল্লরা।

করেছে। 'মিস্কোর' মালিক যার মৃতদেহ মিস্কোর ঝুলন্ত ক্যাবিনে পড়ে ছিলো, তাকে ও হত্যা করেছে। কথাগুলো বললো ক্যাপ্টেন মাওলুং।

ফুল্লরার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই জাহাজখানার ঝুলন্ত ক্যাবিনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কো কো কং মিস্কোর মুখখানা। কি ভয়ংকর লোক ছিলো সে, তাকে কি ভয়ংকরভাবে আক্রমণ করতো। কত কষ্টে ঐ নরজন্তুটার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো ফুল্লরা। মনে পড়ে ঐ দিনটার কথা, বনহুর সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি সাঁড়াসির মতে হাত তার গলা টিপে ধরেছিলো টু শব্দ বের হয়নি তার মুখ থেকে। তারপর আর কিছু মনে ছিলো না। যখন জ্ঞান ফিরে এসেছিলো তখন শার্দুলের মত একটা মুখ আর লালসায় ভরা দুটো চোখ দেখেছিলো। লোকটার ঐ মুহূর্তের হাসি এখনও তার ধমনির রক্ত জমাট করে দেয়...

কিন্তু এত ভাবার সময় নেই ফুল্লরার।

বনহুর তখন ছটফট করছে।

ফুল্লরা বললো—আমি জানি কো কো কং মিস্কোকে ও হত্যা করেনি। আপনারা বিশ্বাস করুন তাকেও হত্যা করেনি। একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ

হয়েছিলো, সেই বিস্ফোরণের ভয়ংকর শব্দে আমি নিজে সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম আর কো কো কং মিস্কো প্রাণ হারিয়েছে....

কোনো কথা শুনতে চাই না। বললো বারবারা।

ক্যাপ্টেন মাওলুং বললো—যদি ওর মুক্তি চাও তাহলে তোমাকে আমরা চাই! বলো রাজি আছো?

ফুল্লরা তাকালো খাঁচায় বন্দী বনহুরের দিকে।

যন্ত্রণায় দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে জ্বলন্ত রশ্মি থেকে নিজকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে বনহুর।

ফুল্লরা বললো—আমাকে যা বলবেন আমি তাই করবো। আমি রাজি আছি আপনাদের প্রস্তাবে।

ক্যাপ্টেন মাওলুং বললেন—মিঃ বারবারা, আলোকরশ্মির সুইচ অফ করে দাও। মেয়েটি রাজি হয়েছে......

বারবারার কানে কথাটা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে অফ করে দিলো। আলোকরশ্মি বিদ্যুৎগতিতে প্রবেশ করলো মেশিনটার মধ্যে। আশ্চর্যভাবে রশ্মিটা ধীরে ধীরে গুটিয়ে এলো যেন একটি জীবন্ত কোনো বস্তু।

ফুল্লরা ছুটে গেলো খাঁচার পাশে। ব্যথাভরা করুণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে। বনহুর মাথায় ও কপালে হাত বুলাচ্ছিলো। সে দেখতে পায়নি ফুল্লরা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ফুল্লরা ডাকলো—বাপুজী।

বনহুর চোখ তুলে তাকালো।

ফুল্লরা করুণ চোখ দুটোর সঙ্গে বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ক্যাপ্টেন মাওলুং অপর একটা সুইচে চাপ দিলো, অমনি খাঁচাটা উঠে গেলো উপরের দিকে। মুক্ত হলো বনহুর।

ফুল্লরা ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে—বাপুজী!

বনহুর ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে কিছু বলতে গেলো কিন্তু তার পূর্বেই বারবারা একটা পিস্তল তুলে ধরলো বনহুরকে লক্ষ্য করে।

ফুল্লরার চোখ সেদিকে যেতেই সে বনহুরকে সরিয়ে দিলো।

পিস্তলের গুলীটা গিয়ে বিদ্ধ হলো ওদিকের দেয়ালে।

গুলীটা দেয়ালে বিদ্ধ হতেই একটা ধূম্ররাশি ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কক্ষে।

পরপর আরও কয়েকটা গুলীর শব্দ শোনা গেলো।

তারপর ধীরে ধীরে এক সময় ধূম্ররাশি হাল্কা হয়ে এলো কিন্তু বনহুর আর ফুল্লরা নেই সেই কক্ষে। তারা দু'জন যেন উবে গেছে হাওয়ায়।

ক্যাপ্টেন মাওলুং এবং বারবারা জানে ওরা কোন্ পথে উধাও হয়ে গেছে।

বারবারা মুখের ও নাকের রক্ত রুমালে মুছে ফেললো, তারপর ক্যাপ্টেন মাওলুংসহ দৌড়ালো সুড়ঙ্গপথ ধরে।

যে স্থানে তখন গুলীবিদ্ধ হয়েছিলো ঠিক ঐ স্থানে একটা নতুন সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে পড়েছিলো।

গুলীটা যে হঠাৎ ঐ স্থানে গিয়ে লাগবে তা ভাবতেও পারেনি বারবারা। ওখানেই ছিলো একটা সুড়ঙ্গমুখ। সুড়ঙ্গমুখে ছিলো একটি গ্যাস বল।

কোনো মুহূর্তে যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে ঐ গ্যাস ফাটিয়ে সারা ঘর ধূয়ায় আচ্ছন্ন করে তারা উধাও হবে কিন্তু হলো ঠিক তার উল্টে। তাদের শিকার পালিয়ে গেলো ঐ পথে।

মিঃ বারবার চিৎকার করে বললেন—ক্যাপ্টেন, আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়, চলুন। চলুন ওদের পাকড়াও করতে হবে।

ক্যাপ্টেন মাওলুং আর বারবারা ছুটলো সেই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গ পথ ধরে।

ওদিকে তখন বনহুর আর ফুল্লরা ছুটছে।

অবিরাম ছোটার পর হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগলো বনহুর আর ফুল্লরার। কেমন যেন স্নিগ্ধ নির্মল হাওয়া।

বনহুর আর ফুল্লরা আরও জোরে পা চালালো।

পিছনে গুলীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। হয়তো বারবারা আর ক্যাপ্টেন মাওলুং তাদের সন্ধানে ছুটে আসছে।

বনহুর ফুল্লরাকে বললো—খুব জোরে দৌড়াও। এবার যদি ওদের কবলে পড়তে হয় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। খুব জোরে দৌড় দাও......

ফুল্লরা আর বনহুর এক একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো তবু দৌড়াচ্ছিলো প্রাণপণে।

একসময় তারা সুড়ঙ্গপথের বাইরে বেরিয়ে এলো। এই সুড়ঙ্গপথ যে একেবারে সেই ভয়ংকর পিরামিডের বাইরে এনে দেবে তো যেন ভাবতে পারেনি ওরা।

সুড়ঙ্গমুখটার নিচেই গভীর জলোচ্ছাস, নিচেই কয়েকটা স্পীড বোট আটকানো আছে। জলোচ্ছাসের দু'পাশে বিরাট উঁচু পর্বতমালা।

জলোচ্ছাস ভীষণ বেগে নেমে চলেছে নিচের দিকে। খাড়া পবর্তমালার মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে প্রচন্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে নেমে আসছে। সেকি ভীষণ জলোচ্ছাস!

বনহুরের তখন ভাবার সময় নেই, ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বললো—পিছনে যমদূত ছুটে আসছে ফুল্লরা, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা যাবে না, উঠে পড়ো।

বনহুর একটা স্পীড বোটে উঠে পড়ে ফুল্লরাকে সাবধানে তুলে নিলো।

ফুল্লরার বুক টিপ টিপ করছিলো।

কি ভীষণ ভয়ংকর জলকল্লোল!

স্পীড বোটখানা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জলতরঙ্গ প্রবল বেগে টেনে নিলো স্পীড বোটখানাকে।

মুহূর্তের মধ্যেই অনেকটা দূরে চলে এলো বনহুর আর ফুল্লরাকে নিয়ে স্পীড বোটখানা।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ক্যাপ্টেন মাওলুং এবং বারবারা এসে দাঁড়ালো সুড়ঙ্গের মুখে। তাকিয়ে দেখলো বনহুর আর ফুল্লরা তাদেরই স্পীড বোট নিয়ে জলতরঙ্গে অনেক দূরে ভেসে গেছে।

ক্যাপ্টেন মাওলুং আর বারবারা লাফিয়ে উঠে বসলো অপর একটি স্পীড বোটে। তারপর তীরবেগে ধাওয়া করলো বনহুর আর ফুল্লরাও স্পীড বোটখানাকে।

প্রচন্ড ঢেউ এড়িয়ে ঝড়ের বেগে বনহুর স্পীড বোটখানাকে চালাচ্ছিলো।

পেছনে বারবারা আর ক্যাপ্টেন মাওলুংয়ের স্পীড বোটধাওয়া করে ছুটে আসছে।

স্পীড বোটগুলো রবারের তৈরি ছিলো তাই রক্ষা। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলো স্পীড বোটকে সহজে তলিয়ে ফেলতে পারছিলো না।

বনহুর নিজে স্পীড বোটের হ্যান্ডেল চেপে ধরে আছে। ফুল্লরা ঠিক তার পাশে, সে যেন ঢেউয়ের প্রবল বেগে ছিটকে না পড়ে সেদিকে তার লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে।

ফুল্লরা পেছনে তাকিয়ে ভীতকণ্ঠে বললো—বাপুজী, একটা স্পীড বোড দ্রুতবেগে এদিকে আসছে.......

বনহুর স্পীড বোটের হ্যান্ডেল চেপে ধরে পেছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—আমি জানি ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করবে।

বললো ফুল্লরা—তাহলে উপায়?

বনহুর এত বিপদে মৃদু হেসে বললো—উপায় যা হয় একটা হবেই। ফুল্লরা, তুমি মোটেই বিচলিত হবে না। একটু অন্যমনস্ক হলেই সব মাটি হয়ে যাবে। তোমাকে হারাবো।

কথার ফাঁকে আর একবার দেখে নিলো বনহুর পেছনে তাকিয়ে।

ওদের স্পীড বোটখানা বেগে এগিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে গভীর জলতরঙ্গে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। সেকি ভয়ংকর ভীষণ অবস্থা।

ঠিক ঐ অবস্থা বনহুর আর ফুল্লরার স্পীড বোটখানার। বড় বড় ঢেউগুলো এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে বনহুর আর ফুল্লরার শরীরে।

ভিজে চুপসে গেছে ওরা।

একদিন যে ক্যাপ্টেন মাওলুংকে বন্ধু বলে মনে করেছিলো বনহুর, আজ সেই ক্যাপ্টেন মাওলুং আর বারবারা তাদের জীবননাশকারী যমদূত হিসেবে ছুটে আসছে তীরবেগে।

মাঝে মাঝে স্পীড বোটখানা জলোচ্ছ্বাসের প্রচন্ড ঢেউ থেকে প্রায় তিন-চার হাত উপরে জাম্পিং হচ্ছিলো। স্পীড বাড়িয়ে নেয় বনহুর তার স্পীড বোটের।

পেছনে বারবারা ও ক্যাপ্টেন মাওলুং ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত তাদের স্পীডবোট নিয়ে উল্কার মত ধাবমান হয়েছে।

বনহুর স্পীড বোট চালনায় অত্যন্ত দক্ষ কাজেই তার সঙ্গে পেরে উঠা ক্যাপ্টেন মাওলুংয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু প্রাণপণে চালাচ্ছে ওরা।

সময় সময় একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ছে ক্যাপ্টেন মাওলুংয়ের স্পীড বোটখানা।

যে কোনো মুহূর্তে দু'পাশের পর্বতমালার সঙ্গে ধাক্কা লেগে চুরমার হতে পারে তাদের দেহ। অবশ্য স্পীড বোটগুলোর কোনো ক্ষতি সাধন হবে না। কারণ সে গুলো ছিলো রবারের তৈরি। সুচতুল ক্যাপ্টেন মাওলুং এবং বারবারার দল একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করেছে অতি সুকৌশলে। কেউ ভাবতেও পারবে না সেই দেয়ালে কোনো গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে।

বনহুর এত বিপদেও ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় কারণ ঐ সময় বারবারার গুলীতে যদি গ্যাস বল ফেটে না যেতো তাহলে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতো না ঐ দু'জন নরপশুর কবল থেকে।

ফুল্লরা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

বনহুর বললো—ফুল্লরা, তুমি আমাকে এঁটে ধরো, পিছনের স্পীড বোট একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে।

বাপুজী, আমার বড্ড ভয় করছে, আর বুঝি রক্ষা পেলাম না আমরা। বাপুজী......

ঠিক ঐ সময় প্রচন্ড ঢেউগুলোর নিচে চলে গেলো তাদের স্পীড বোটখানা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠলো উলকার মত দ্রুত গতিতে।

বনহুর ভাবলো আর বুঝি ফুল্লরাকে বাঁচানো গেলো না।

কিন্তু আশ্চর্য, ফুল্লরা তেমনি বনহুরকে জাপটে ধরে বসে আছে, মাথাটা সে গুঁজে রেখেছে বনহুরের পিঠে।

এবার তাদের স্পীড বোটখানা সম্মুখে কতকগুলো বরফের চাপ এসে বাধার সৃষ্টি করলো। বনহুর এর পূর্বে আরও কয়েকবার এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তাই সে অভিজ্ঞতা ছিলো এ ব্যাপারে। স্পীড বোটখানাকে বরফের চাপের উপর দিয়ে দ্রুত চালিয়ে চললো।

এবার বাধাপ্রাপ্ত হলো ক্যাপ্টেন মাওলুং ও মিঃ বারবার। তাদের স্পীডবোটখানা আটকা পড়লো বরফের চাপের সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন মাওলুং কিছুতেই বরফের উপরে তাদের স্পীড বোটখানাকে তুলতে পারলো না।

ততক্ষণে বরফের উপর দিয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে উড়ে এগিয়ে চললো বনহুর আর ফুল্লরার স্পীড বোটখানা।

❑

হঠাৎ একটা শব্দে আস্তানার প্রহরীরা সজাগ হয়ে উঠলো।

বিপদ সংকেতধ্বনি হলো আস্তানার ভিতরে।

সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো আস্তানার সবাই।

এমন কি নূরী নাসরিন এরাও জেগে উঠলো। সবাই বেরিয়ে এসে একত্রিত হলো আস্তানার গুপ্তগুহায়।

বিপদ সংকেতধ্বনি তখনও হচ্ছে।

বনহুরের অনুচরদের মধ্যে কায়েস সর্বাগ্রে অগ্রসর হলো আস্তানার ফটকের দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন অস্ত্রধারী একটা লোককে পাকড়াও করে নিয়ে এলো কায়েসের সম্মুখে। অস্ত্রধারিগণের হাতে কোনো আলো না থাকায় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না।

কায়েসের পেছনে অন্যান্য অনুচর জমায়েত হয়েছে; নূরী আর নাসরিনও এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে।

কায়েস গম্ভীর কণ্ঠে বললো—যাও, মশাল জ্বেলে নিয়ে এসো।

দু'জন অনুচর মশাল জ্বেলে নিয়ে হাজির হলো। মশালের আলোতে সবাই দেখলো একটা ক্ষতবিক্ষত লোককে তারা পাকড়াও করে এনেছে।

কায়েস অনুচরটার হাত থেকে মশালটি নিয়ে উঁচু করে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফূট ধ্বনি করে ডান হাতের তালুতে চোখ ঢেকে ফেললো।

নূরী আর নাসরিন পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো।

নূরীর দৃষ্টি বন্দীর মুখে পড়তেই সে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—রহমান ভাই!

নাসরিন আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—একি দেখছি......

রহমান! রহমান ভাই! কায়েস কথাটা বলে ঝুঁকে পড়লো রহমানের মুখের কাছে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তোমার একি অবস্থা রহমান ভাই? তোমার বাম হাতখানা কি হলো?

রহমানের মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি।

চোখে উদাস চাহনি, শরীরের নানা স্থানে ক্ষতচিহ্ন। কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো তার, শুধু তার কণ্ঠ দিয়ে বের হলো—পানি দাও!

কায়েস মুহূর্ত বিলম্ব না করে উচ্চকণ্ঠে বললো—তোমরা হা করে দেখছো কি? রহমান ভাই ফিরে এসেছে। সে ভীষণ আহত তাড়াতাড়ি তার সেবার জন্য আস্তানার ভিতরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ততক্ষণে নাসরিন ছুটে গিয়ে এক গেলাস পানি এনে স্বামীর মুখে তুলে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো—ওগো পানি খাও! বলো এতদিন কোথায় ছিলে?

রহমান এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে খালি গেলাসটা নাসরিনের হাতে ফিরিয়ে দিলো।

এবার রহমানকে নিয়ে আস্তানার ভিতরে নাসরিনের কক্ষে শুইয়ে দেওয়া হলো।

অনুচরগণ যে যার কাজে ফিরে গেলো।

নূরী আর নাসরিন বসলো রহমানের দু'পাশে।

কায়েস বললো—রহমান ভাই, তোমার এ অবস্থা কেমন করে হলো? তোমার বাম হাতখানা বিনষ্ট হলো কি করে?

রহমান নীরব।

কায়েস বললো আবার—রহমান ভাই, চুপ করে থেকো না, কথা বলো? তোমার এ অবস্থা কেন আর সর্দার কোথায়?

রহমান তবু নিশ্চুপ।

নূরী দু'হাতে চেপে ধরলো রহমানের ডান হাতখানা, ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—রহমান ভাই, ওকে তুমি কোথায় রেখে এসেছো বলো? বলো রহমান ভাই?

রহমান বললো—আমি জানি না।

তুমি জানো না?

না?

বলো কি রহমান ভাই!

হাঁ, আমি জানি না। আমাকে তোমরা প্রশ্ন করো না।

রহমানের কথা শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠে নূরী। সে জানতো একদিন ওর অবস্থা এমনি ঘটবে। কারণ সর্বক্ষণ সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছিলো।

নাসরিনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কায়েস তার দু'জন অনুচরকে পাঠালো ডাক্তার আনবার জন্য। রহমানের চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

এরপর চিকিৎসা চললো রহমানের।

সবাই উন্মুখ হয়ে আছে, একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তারা রহমানের মুখে সব জানতে পারবে। যদিও সর্দার আর রহমান একসঙ্গে আস্তানা ত্যাগ করেনি, তবুও সবাই জানে সর্দার আর রহমান মিলিত না হয়ে পারেনি। এবং সেই ভরসা নিয়েই ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে তার দিকে, নিশ্চয়ই সঠিক সংবাদ পাবে তারা রহমানের মুখে।

কিন্তু রহমান সুস্থ হবার পরও কোনো কথা ব্যক্ত করলো না, কেমন যেন নিশ্চুপ বনে গেছে রহমান।

আস্তানায় ফিরে আসার পর তার মুখে কেউ একটি বা দুটি কথার বেশি শুনতে পায়নি। সব সময় একা একা বসে ভাবে সে।

রহমানের গাম্ভীর্যতা ভীষণ ভাবিয়ে তুললো আস্তানার অনুচরগণকে।

সেদিন নির্জন জঙ্গলে একটি বড় গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিলো রহমান।

নাসরিন এসে পাশে দাঁড়ালো, বললো—কি ভাবছো? কথাটা বলে কাঁধে হাত রাখলো সে স্বামীর।

রহমান যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো, কোনো জবাব দিলো না।

নাসরিন বললো—চুপ করে থেকো না। কথা বলো, কথা বলো?

রহমান ফিরে তাকালো নাসরিনের মুখের দিকে। চোখ দুটো ছলছল করছিলো ওর। একটা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে রহমান—নাসরিন, জানি না কেন এ অভিশাপ....গলা ধরে আসে রহমানের।

নাসরিন স্বামীর চোখের পানি আঁচলে মুছে দিয়ে বললো—ছিঃ দুঃখ করো না। হাত হারিয়েছো তার জন্য মন খারাপ করো না লক্ষ্মীটি। তুমি যে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছো এটাই যথেষ্ট। আমি জানি একটা হাত হারালেও তুমি সেই তুমিই আছো। তোমার মনোবল আর সাহসের কাছে যে কোনো শক্তি পরাজয় বরণ করবে।

তোমার কথা যেন সত্যি হয় নাসরিন।

হবে! নিশ্চয়ই হবে।

নাসরিন!

বলো?

শুধু আমি হাতখানাই হারাইনি, হারিয়েছি আমাদের মাথার মনি সর্দারকে। হারিয়েছি ফুল্লরা মা মনিকে।

এবার নাসরিনের চোখ দুটো ছলছল হয়ে উঠলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে তার নয়নের মনি ফুল্লরার কচি মুখখানা। সেই যে কোথায় চলে গেলো সে জানে না, জানে না আস্তানার কেউ। এমন কি সর্দার পর্যন্ত তার সন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তারা জানে মালোয়া ছাড়া তাকে কেউ উধাও করেনি, কারণ ফুল্লরার নিরুদ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে মালোয়াও নিখোঁজ হয়েছে।

বললো রহমান—কি ভাবছো নাসরিন?

আঁচলে চোখ মুছে বললো নাসরিন—কিছু না।

আমি জানি কত ব্যথা আর বেদনা লুকিয়ে আছে তোমার মনে। ফুল্লরার মুখখানা যে কিছুতেই ভুলতে পারি না নাসরিন...

কিন্তু কি করবার আছে বলো?

নাসরিন!

বলো?

আমরা তাহলে কোন দিনই কি আর ফুল্লরাকে ফিরে পাবো না?

উদাস কণ্ঠে বললো নাসরিন—জানি না!

জানো নাসরিন, আমার মনে হয় ফুল্লরা বেঁচে আছে। সে আবার ফিরে আসবে আমাদের কোলে.......

সেই দোয়া করো ওগো মা মনি যেন ফিরে আসে। তাকে বুকে নিয়ে যেন শান্তি লাভ করতে পারি। আচ্ছা তুমি তো বললে না সরদার কোথায়? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কিনা?

হাঁ, হয়েছিলো।

সত্যি বলছো?

হাঁ নাসরিন।

তাহলে সর্দারের সম্বন্ধে কিছু বলছোনা কেন?

সব জানতে পারবে নাসরিন। সব জানতে পারবে শুধু সর্দার নয়, তার সঙ্গে ছিলো দিপালী.:....

দিপালী!

হ্যাঁ।

রহমান যতটুকু জানে, সব ধীরে ধীরে বলতে লাগলো। সে জানে না তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেছে তাদের সর্দারের জীবনে। দিপালীকে তারা চিরদিনের জন্য হারিয়েছে, পৃথিবীর মানুষ জানে না সে এখন কোথায়। রহমান সব কথা একটার পর একটা গুছিয়ে বলতে লাগলো। রহমানের কথাগুলো শুনে নাসরিন বুঝতেই পারেনি।

রহমান যখন বলছিলো তখন কায়েস ও নূরী দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে শুনে যাচ্ছিলো।

বলে চলেছে রহমান—ধ্বংসস্তূপের মধ্য হতে বের হবার পর দেখলাম বাম হাতখানা আমার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। ঐ হাতখানা আমার বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। হাতখানার জন্য আমি ছুটতে বা চলতে পারছি না, বড় কষ্ট হচ্ছিলো, তাই দাঁতে দাঁত চেপে হাতখানা দেহে থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম...

কি নিষ্ঠুর তুমি! বললো নূরী।

রহমান বললো—এ ছাড়া. কোনো উপায় ছিলো না।

কায়েস গম্ভীর কণ্ঠে বললো—রহমান, তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছো। তোমাকে ফিরে পেয়ে আমরা যেন নবজীবন লাভ করলাম। কিন্তু সর্দারকে আমরা হারাবো এটা আমি ভাবতেও পারিনি কোনোদিন। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো কায়েসের গলা।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব।

একটা থমথমে ভাব বিচরণ করছে জায়গাটার চারপাশে।

সর্দারের অন্তর্ধানের পর থেকেই একটা গভীর বেদানার ছাপ ফুটে উঠেছিলো আস্তানার সবার মুখে। সবাই প্রতিটা মুহূর্তে সর্দারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছে দীর্ঘ দিন কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

অনুচরগণ সর্দারের অভাব সর্বতোভাবে অনুভব করলেও কাজ তো বন্ধ রাখা যায় না। বনহুরের নিজস্ব অস্ত্রাগার আছে, নিজস্ব পাওয়ার হাউস আছে, আছে বেশ কয়েকটা জাহাজ, যার সন্ধান বাইরের কেউ জানে না। এ ছাড়া বনহুরের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি দ্বীপ, শহর এবং গ্রাম আছে। এ সব স্থানে প্রতি মাসে কিছু কিছু অর্থ বনহুর নিজ হাতে দান করতো, তাদের সাহায্য তো আর বন্ধ করা যায় না। শহরে, বন্দরে এবং দ্বীপ ও গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থ ও খাদ্য সরবরাহ করতো বনহুর। এ ছাড়াও বহু কাজ রয়েছে আস্তানার।

দীর্ঘ সময় সর্দার এবং রহমান না থাকায় কায়েস এসব কাজ সমাধা করে নিচ্ছিলো। সে নিজে এবং অন্যান্য অনুচরের দ্বারা শহরে, বন্দরে, দ্বীপাঞ্চলে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলো।

কায়েস রহমানকে ফিরে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো, তাঁর মনে এলো উদ্যম আর ভরসা।

রহমান বললো সবাইকে দেখছি কিন্তু জাভেদ কোথায়?

সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

রহমান বুঝতে পারলো বিপদ যখন আসে চারদিক দিয়েই আসে। নিশ্চয়ই জাভেদের কিছু ঘটেছে নইলে সবাই অমন মুখ চাওয়া চাওয়ি করবে কেন। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো কায়েস—তোমরা চুপ করে থেকো না, বলো জাভেদ কোথায়?

নূরী এবার শান্ত স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলো—জাভেদ হারিয়ে যায়নি, সে আছে।

কোথায়? কোথায় সে বলো?

এবার কায়েস বললো—সে আশার কাছে চলে গেছে। আশাকে জাভেদ মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে...

রহমান বললো—আশা!

হাঁ, সেই আশা! বললো নূরী।

রহমান বললো—আশা জাভেদকে নিজ সন্তান করে নিয়েছে বলো কি নূরী!

রহমান ভাই, এতে আমার দুঃখ নেই, বরং আনন্দ।

তুমি...

হাঁ, আমি আনন্দিত।

নূরী!

রহমান ভাই জাভেদকে আশা ভালবাসে। বেচারী অন্তর দিয়ে আমার হুরকে ভালবেসেছিলো কিন্তু সে তাকে পায়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নূরী, তারপর বলে—সে একদিন এসে আমার কাছে ভিক্ষা চাইলো।

ভিক্ষা চাইলো?

হাঁ কিন্তু কোনো বস্তু বা মূল্যবান সামগ্রী নয়, সে চাইলো আমার জাভেদকে।

আর তুমি তাই দিয়ে দিলে? নিজ সন্তানকে দিয়ে দিলে তুমি?

রহমান ভাই, মায়ের স্নেহের চেয়ে বেশি স্নেহ পাবে সে আশার কাছে।

রহমান কোনো জবাব দিলো না।

এবার সে বেশ বুঝতে পারলো জাভেদকে কেন দেখতে পাচ্ছে না। জাভেদের মুখখানা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো তার।

বললো নূরী—রহমান ভাই, তুমি জাভেদের জন্য ভেবো না। সে কচি শিশুটি নেই—বেশ বুঝতে শিখেছে। পথ সে চেনে, কাজেই যখন সে মাকে স্মরণ করবে তখনই সে আসতে পারবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ছুটে আসে একজন অনুচর—কায়েস, কায়েস, আমাদের শহর আস্তানার একজন অনুচরকে পুলিশমহল সন্দেহ করে পাকড়াও করেছে।

কায়েসের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

রহমান অনুচরটার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনলো, তার চোখ দিয়েও যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বললো রহমান—আমাদের অনুচরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?

হাঁ হাঁ রহমান ভাই। সকালে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে হাঙ্গেরী কারাগারে। সর্দারের সন্ধান সংগ্রহ করাই হলো তাদের উদ্দেশ্য।

রহমান বললো—সর্দারের সন্ধান সে কিছুই জানাতে পারবে না, ওর উপর কঠিন নির্যাতন চলবে...না, না এটা হতে দেবো না আমি।

নাসরিন ওকে এঁটে ধরলো—না, তা হয় না। তুমি যে অসুস্থ।

তবু যেতে হবে আমার। বললো রহমান।

কায়েস বললো—রহমান ভাই, আমি যাচ্ছি। তুমি আস্তানার ভিতরে যাও।

কিন্তু ততক্ষণে রহমান উঠে দাঁড়িয়েছে।

এ মুহূর্তে সে ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে, কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। রহমান তার এক অনুচরের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে ছুটে গেলো অশ্বশালার দিকে।

সবাই একেবারে অবাক।

কায়েস হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে, রহমান। একি করছে! তার বাম হাতখানা নেই, তা ছাড়া তার শরীর ভীষণ খারাপ।

নূরীর দু'চোখেও বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

রহমান ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে বললো—অনুচরটার নাম কি তা তো বললে না তোমরা?

ইয়াকুব ভাই।

ইয়াকুব ভাই পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছে?

হাঁ।

তুমি তো তার নাম বলোনি? শুধু বলেছিলে শহরের আস্তানার একজন অনুচর।

বলিনি, বললে তোমরা ব্যস্ত হবে, তাই....

হীরু, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে শাস্তি দিতাম কিন্তু...কথাটা বলেই রহমান অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো।

ঐ সময় ব্যস্তকণ্ঠে বললো অনুচরটা—রহমান ভাই, আরও একটা কথা শোনো।

বলো হীরু, বলো, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

রহমান ভাই, ইয়াকুব শহরের আস্তানা থেকে কিছু অর্থ দ্বীপাঞ্চলে দিতে যাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে সে পুলিশের কবলে পড়লো।

হীরুর কথা শেষ হয় না, রহমান ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

সবাই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে রহমানের চলে যাওয়া পথের দিকে। একটু পূর্বে যে রহমানের অবস্থা করুণ এবং উদাস ছিলো সেই রহমান তাদের এক অনুচরের বিপদ সংবাদ শুনে সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো।

দূর থেকে ভেসে আসছে রহমানের অশ্বপদশব্দ।

নূরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা অশ্রু।

নাসরিন নূরীর হাত ধরে বললো—চলো নূরী, আস্তানার ভিতরে ফিরে যাই।

নূরী বললো—চলো।

❑

আস্তানায় কারও চোখে ঘুম নেই।

রহমান একা চলে গেলো, কাউকে সে সঙ্গে নিয়ে গেলো না। হয়তো বা নতুন কোনো বিপদ বাধিয়ে বসবে। একটা হাত তার নেই, এক হাতে সে ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরবে না পিস্তল চালাবে!

সবার মনে দুশ্চিন্তা।

রাত বাড়ছে।

আস্তানা নীরব।

শুধু জীবজন্তুর গর্জন আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রহরীদের ভারী বুটের আওয়াজ ভেসে আসছে আস্তনার ফটক থেকে।

নূরীর চোখে ঘুম নেই।

তার হুর কি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না? ঐ দেবসমতুল্য মুখমন্ডল আর কি সে দেখতে পাবে না? একটা ব্যথা গুমড়ে কেঁদে উঠে নূরীর মনে।

নূরী বিছানায় শুয়ে ছটফট করে।

দ্বিতীয় গুহায় নাসরিন নিদ্রাহীন চোখে প্রহর গুণছে। কতদিন পর ফিরে এলো রহমান কিন্তু তাকে সে যে অবস্থায় পেলো তা বর্ণনাতীত। তবু রহমান জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে, এটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

নাসরিন কার জন্য ভাববে—স্বামীর জন্য না কন্যার জন্য। ফুল্লরার ফুলের মত মুখ তাকে আজও অস্থির করে তোলে। কচি মুখে আম্মু ডাক সে আর শুনতে পাবে না...

নাসরিন শয্যা ত্যাগ করে পায়চারী করে চলে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার কানে ভেসে আসে অশ্বপদশব্দ।

সচকিত হয়ে উঠে নাসরিন।

নূরীও পাশের গুহায় শয্যায় উঠে বসে পড়ে কান পাতে। তবে কি রহমান ফিরে আসছে?

অন্যান্য অনুচর সবাই সজাগ হয়ে উঠলো।

কায়েস এসে দাঁড়ালো আস্তানার ফটকে।

দু'জন মশালধারী অনুচর কায়েসের দু'পাশে দন্ডায়মান ছিলো।

রহমান যখন ঘোড়ায় চেপে বসে হীরুর সঙ্গে কথা বলছিলো তখন কায়েস অপর একটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে যাচ্ছিলো। তার উদ্দেশ্য রহমানের সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু রহমান কায়েসকে যেতে বারণ করেছে—শুধু একবার নয়, কয়েকবার রহমান কায়েসকে অশ্ব পৃষ্ঠে চাপতে বারণ করেছে।

কায়েস রহমানের বারণ উপেক্ষা করে অশ্বপৃষ্ঠে চাপতে যাচ্ছিলো তখন রহমান পিস্তল উদ্যত করে বলেছিলো তোমাকে হত্যা করে তারপর আমি যাবো—

কায়েস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সে বুঝতে পেরেছিলো রহমান চায় কায়েস যেন আপাতত আস্তানা ছেড়ে কোথাও না যায়। এখন রহমানের সেই কথাগুলোই কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

অশ্বখুরের শব্দ ক্রমে আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে নূরী নাসরিন এবং অন্যান্য অনুচর এসে আস্তানার মুখে জমায়েত হয়েছে।

এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে ইয়াকুবসহ রহমান এসে হাজির। ইয়াকুবের হাতে হাতকড়া, চুল এলোমেলো। কপালের একপাশে কেটে রক্ত ঝরছে।

রহমানের অবস্থাও তাই।

একটা হাতে সে কিভাবে পুলিশ বাহিনীকে পরাজিত করে ইয়াকুবকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

রহমানেরও কপাল কেটে গেছে, ঠোঁটের একপাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জামাটার কিছু অংশ ছেঁড়া।

অশ্বটা এসে দাঁড়াতেই রহমান নেমে দাঁড়ালো এবং ইয়াকুবকে নামিয়ে নিলো সাবধানে। ওর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা ছিলো তাই অসুবিধা হচ্ছিলো ওর।

ওরা দু'জন নেমে দাঁড়াতেই নাসরিন এসে রহমানকে জাপটে ধরলো—তোমার একি অবস্থা হয়েছে?

বললো রহমান—বেশ সুস্থ আছি আমি।

ঠিক ঐ সময় একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো রহমান আর নাসরিনের পায়ের কাছে।

নাসরিন তীরফলকটা তুলে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—কে ঐ তীর ছুড়েছে?

বললো রহমান—ঐ তীরফলকটার পেছনে আছে গভীর রহস্য...কথাটা বলে সে তীরফলকটা দেখতে লাগলো।

নূরী এবং নাসরিন অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো রহমানের দিকে। একটা হাত হারিয়েও রহমান পূর্বের চেয়ে কোনো অংশে শক্তি এবং মনোবল কম হয়নি বরং আগের চেয়ে আরও দুঃসাহসী মনে হচ্ছে তাকে।

পরবর্তী বই

তীরফলকের গভীর রহস্য